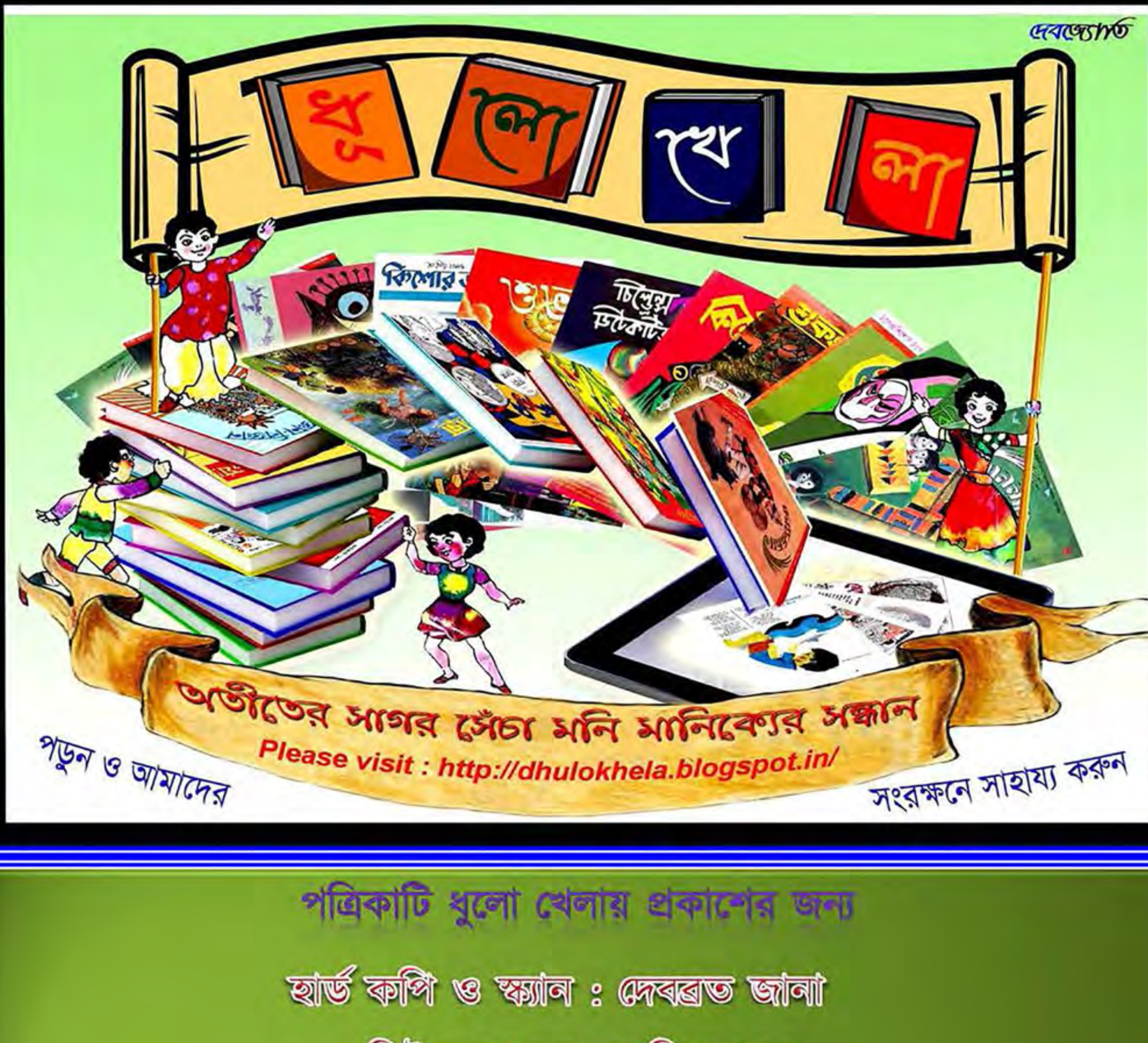
ঘরোয়া

সত্যজিৎ সংখ্যা

শুক্রবার ঃ ২৬ মে '৭২

দু' টাকা





পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ও স্ক্যান : দেবব্রত জানা

এডিট করেছেন : সুজিত কুন্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষনীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান আর্কাইভের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : dhulokhela@gmail.com


লাবণ্যের
পরশ...
হেজলীন স্নো
হেজলীন সবার সেরা
বিউটি স্নো,
আপনার কোমল
কান্তির যত্ন নেয়।
হেজলীন স্নো-র
হাল্কা মোলায়েম
পরশ সমানভাবে
ছড়িয়ে প'ড়ে দেহ-
লাবণ্যে মার্জিতশ্রী
আনে ও ত্বকের যত্ন
নেয়। আপনার
দেহকান্তি নিখুঁত
তারুণ্যমণ্ডিত ও
কমণীয় করে তুলতে
রোজ এটি মাখুন।
তরুণের স্বপ্নমাখানো
স্বাভাবিক
কান্তির উৎস
হেজলীন স্নো।
HAZELINE SNOW
HAZELINE SNOW
WITH LUSINE

SHB-8295 BN



সাইজ ৪-১০
১৩.৯৫
জুবিলি ৩৩
সাইজ ৪-১০
২১.৯৫
গরমে চলুন
হালকা পায়ে
বাটার স্যান্ডাল আর চপ্পলগুলির নকশাই এমন, যাতে সহজে হাওয়া খেলাতে পারে। সুশ্রী গড়ন দেখেই বুঝবেন পায়ের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মনে রেখেই তৈরি। সুঠাম ভঙ্গি চলার ছন্দ হালকা ও সাবলীল করে দেবে। বাটার দোকানে এ-রকম ছিমছাম স্যান্ডাল ও চপ্পলের যেন মেলা বসে গেছে। এখানে তার মাত্র কয়েকটি নকশা দেখছেন। আসুন না, একবার পরে দেখুন।
Bata
সাইজ ৪-১০
২০.৯৫
সানওয়ে ৩২
সাইজ ৪-১০
২০.৯৫



এখন ৪ ধরণের চুলে
৪ রকমের শ্যাম্পু
আরো বেশি ঘন বাড়তি গুণে
নতুন
গ্লস এন গ্লো
লেমন • ল্যানোলিন
এগ অ্যাণ্ড প্রোটিন • ন্যাচারাল
বিশেষভাবে তৈরী এই শ্যাম্পু ব্যবহার করুন চুল কি পরিষ্কার আর রেশমী কোমল!
সবরকমের গ্লস এন গ্লো শ্যাম্পুতেই আছে এই বাড়তি গুণ। ফেনা হয় সংগে সংগে। প্রচুর ফেনা। পরিষ্কার হয় অনায়াসে। মাথায় একটুও ময়লা থাকে না। চুল হবে রেশমী কোমল।
তেলতেলে চুলের জন্য লেমন শ্যাম্পু। আর খসখসে চুলে ল্যানোলিন। রুক্ষ চুলে সজীবতা আনে এগ অ্যাণ্ড প্রোটিন। স্বাভাবিক চুলের জন্য অবশ্যই ন্যাচারাল শ্যাম্পু।
নতুন
গ্লস এন গ্লো
আরো বেশি ঘন বাড়তি গুণের শ্যাম্পু
ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এর তৈরী


আপনার ত্বকের প্রয়োজন
বোরোলীন
সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম
বোরোলীন
ত্বকের সমস্যার সমাধান যেন।
কাটা-ছেঁড়া-ফাটা শুষ্ক-রুক্ষ
কিংবা বিদীর্ণ ত্বক
নিমেষে সুস্থ স্বাভাবিক।
প্রতিদিন। প্রতিরাত্রে। নিয়মিত। সর্বাঙ্গীণ।
বোরোলীন
সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম।





প্রস্তুতকারক : এইচ. বি. এণ্ড কোং জি পি ও বক্স ৪৭৬ ক'লকাতা-১

দশম বর্ষ

ঘরোয়া

৩৫ সংখ্যা

১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯ ॥ ২৬ মে ১৯৭২

সূ চি প ত্র

...আলোচনা চক্র...

প্রচ্ছদপট : সন্দীপ রায়। অলংকরণ : সুবোধ দাশ... ...: নিমাই ঘোষ
সম্পাদনা : বীরেন সিমলাই। সহযোগিতা : দিলী... ...ত রায় চৌধুরী,
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর ঘোষ, সুব্রত র... ...র, সুব্রত লাহিড়ী

কেন সত্যজিৎ সংখ্যা

সত্যজিৎ বিদেশে সুখ্যাত, দেশে বিখ্যাত কিন্তু জনপ্রিয় নন
আমাদের দেশে সত্যজিৎ-প্রতিভা সম্পর্কে যতটুকু আলোচনা হয় তা নেহাতই
চক্ষুলজ্জার জন্যে। আমরা সত্যজিৎ প্রশংসায় যতটা না সৎ
তার চেয়ে বেশি কর্তব্যপরায়ণ। শূন্যগর্ভ বিশেষণ ছাড়া আর
কোনো কিছু সম্বল নেই আমাদের
অপ্রিয় হলেও এইটাই ঘটনা
তিনি আমাদের কাছে শুধুই একজন নামী
মানুষ—শিল্পী এবং মানুষ সত্যজিৎ সম্বন্ধে
এদেশে এখনও কোনো কৌতূহল নেই।

পৃথিবীর চলচ্চিত্রে প্রচণ্ড এক দুঃসময়ে
সত্যজিতের নাটকীয় আবির্ভাব, উজ্জ্বল উপস্থিতি:
চলচ্চিত্রের নিও রিয়ালিজম তখন অস্তের মুখে, ডি সিকা আর
ফেলিনি কোনোক্রমে তাঁদের পুরনো বিশ্বাসকে, আদর্শকে
আঁকড়ে আছেন, বার্গম্যান তখন অনেকের মধ্যে একজন
স্মাইলস অফ এ সামার নাইট বিদেশে প্রদর্শিত হয় নি
সোভিয়েত রাশিয়ার আইজেনস্টাইন,
পুডভকিন, ডভঝেনকো অতীত
অন্যান্যেরা হিমশীতল, হলিউড সিড গ্রমানের হাতে
টিমটিম করে টিঁকে আছে
ইংল্যাণ্ডের এ্যাংরি ইয়ংমেন বুদ্ধিজীবী সঙ্কটের অতলস্পর্শ
গভীরে অচেতন এবং ঠিক এই বিপন্ন মুহূর্তে
জাপানের ইকিরা কুরোসায়া আর ভারতবর্ষের
সত্যজিৎ রায়কে দেখা গেলো···

সত্যজিৎ এত খ্যাত কেন ?
ভারতবর্ষের পেটমোটা প্রযোজকরা বলবেন,
ভারতের দারিদ্র্যকে সত্যজিৎ বিদেশে
বিক্রি করেন
কিন্তু এ যুক্তি কতটা অর্থহীন তা আজ আমরা সবাই
জেনে গেছি আরও একটু বুদ্ধিমান লোক জিজ্ঞেস
করতে পারেন, সত্যজিৎ কী সত্যিই প্রগতিশীল ?
সামাজিক সমস্যার প্রশ্নে সত্যজিৎ অনুপস্থিত থাকেন কেন ?
সত্যজিৎ নিজে এ ধরনের প্রশ্নের জবাব কোনোদিন
সরাসরি দেন নি।

আমাদের মনে হয়
সত্যজিতের প্রয়োজন নেই এই জাতীয় প্রশ্নের জবাব দেওয়ার
এই জাতীয় প্রশ্ন-উত্তর একজন রাজনীতিকের জন্যে
মূলত এগুলি রাজনীতির প্রশ্ন।

সত্যজিৎ বলেছেন
আমার কাজ সৎ ও স্বচ্ছন্দভাবে ঘটনার জট খোলা
এবং দর্শকের কাজ সিদ্ধান্ত নেওয়ার
মানুষকে সৎ ও স্বচ্ছন্দভাবে ভাববার সুযোগ দেওয়া

সিনেমার একটা নিজস্ব ভাষা আছে সত্যি কথা
বলার জন্যে : বাণী কিংবা উপদেশদানের
ব্যাপার নয় এটা।

জীবনের অর্কেস্ট্রাকে স্পষ্ট করে শোনাবার জন্যে
সত্যজিতের প্রতিটি ছবিই
একটি আবিষ্কার
জীবনের মূল্যবোধের প্রকাশ…

তাই সত্যজিতের ছবিতে নেই
বার্গম্যানের ব্যক্তিকেন্দ্রিক নিউরোসিস
আন্তোনিয়নির নৈরাজ্য এ্যাণ্ডারসনের ক্রোধ
অথবা কুরোসাওয়ার পীড়ন
আছে শুধু মানবিক মূল্যবোধ…

সত্যজিৎকে বুঝতে হলে তাঁর একটা মাথা চাই

রবার্ট স্টিল

যে শিল্পকে কোনো জাতি সমর্থন করে ও প্রত্যাখ্যান করে, সেই শিল্প জাতির স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতিকে উত্তাপ দেয়, পরিমাপকের কাজ করে। মহৎ সংস্কৃতি মহৎ শিল্পকে সমর্থন করে, শিল্পের উন্নতির সহায়ক হয়। শিল্পের মাধ্যমে জাতির সূচিপত্র জানা যায়। শিল্পের মাধ্যমে ব্যক্ত হয় অবলুপ্তির সতর্কতা, সঙ্কটের গভীরতা, অসুস্থতা ও অধঃপতনের ইঙ্গিত।

শিল্পের মাধ্যমে জানা যায় সময় ও সমকালের মহত্ত্ব। রাজনীতিক, অর্থনীতিক অথবা সাংস্কৃতিক কোলাহলের মধ্যেও যদি শিল্পের জন্ম হয়, তাহলে বুঝতে হবে তা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই জন্ম নিয়েছে, কোনো বিশেষ কারণে নয়।

আর যখনই এ ঘটনা ঘটে, তখনই দেখা যায় শিল্পী এমন একটি দেওয়াল তৈরি করেছেন নিজের চারপাশে যেখানে তাঁর জীবন ও কর্ম, যাই ঘটুক না কেন, এতটুকু বিচলিত হয় না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও আজকাল এই ধরনের একটি ব্যাপার চলছে, বিশেষ একটি তাঁবু তৈরি হয়েছে। এই তাঁবুতে অত্যন্ত অশালীন কিন্তু পরিচিত একটি রুচির মিল-মিশেল আছে, যার জন্যে তথাকথিত রুচিবানদেরও এখানে দেখা যায়।

চলচ্চিত্রের মধ্যেও এই তাঁবুর প্রভাব পড়েছে। মারিয়া মন্টেজের ছবি, কোরাস মেয়ে, জলপরী, তিরিশের বাসবি বারকলে নাচের ছবি, পিয়ানো এবং আয়না ; কিন্তু ইন আফ্রিকা-র শার্লি টেম্পল ; টেলিভিসনের পর্দায় মাতাল জুডি গার্লাণ্ডের গান ; রিন টিন টিন, স্যালোম-এর নাজিমোভা ; অথবা পুরনো ছবির জিঞ্জার রজার্স (ফ্রেড এ্যাসটেয়ারের সঙ্গে বিয়ের আগে) এ সবই হচ্ছে তাঁবুর ঘটনা।

ব্যাটম্যানকে দেখুন না! টি-ভি র ব্যাটম্যানকে তরুণ-তরুণীরা শয়নকক্ষের দেওয়ালেও ল ট কা চ্ছে। এ্যানডি ওঅরল এক বিরাট সাফল্য এবং ওর প্রতিটি ছবিকে ইচ্ছে করে বিরক্তিকর করে দেওয়া হয়। এ্যানডির প্রত্যেকটা ছবি এক থেকে আট ঘণ্টা অবধি টানা চলে।

যেমন, ক্যামেরার সামনেই একটা লোক তেড়ে ঘুম দেবে, অন্যদিকে আর একটা লোক ব্যাগ থেকে কিছু বার করে খেতে শুরু করবে, এবং এই তক্কে ক্যামেরাটা গোটা এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংটাকে চোখ বু লি য়ে নেবে। এ্যানডির ফিচার ছবি 'মাই হাসলার' (সমকামী পতিতা) দেখুন, দেখবেন ছবির অর্ধেক সময় একটি লোক বালির ওপর শুয়ে আছে, আর একটি লোক বাথরুমে। প্রত্যেক মুহূর্তে দর্শক ভাবছে নায়ক এবার নগ্ন হবে, কিন্তু এ্যানডির কায়দা যারা বুঝেছে তারা জানে শেষ অবধি কিছু হবে না। এবং হয়ও না।

একটা নাটক দেখতে গিয়েছিলাম। পর্দা ওঠার এক ঘণ্টার মধ্যেও কিছু ঘটলো না, হঠাৎ দেখা গেলো একটি লোক স্টেজে ঝাড়ু বোলাতে বোলাতে ঢুকছে। তারপর, আরো এক ঘণ্টা কেটে গেলো, কিছুই ঘটলো না। এরপর হঠাৎ একটা প্রোজেক্টর চালানো হোলো, দেখা গেলো প্রোজেক্টরে ফিল্ম নেই। পর্দার ওপর কয়েক টুকরো আলো। ব্যাস।

'ভাস্কর্য' দেখানো হোলো মেয়েদের সিল্কের মোজা ও ভেতরের পোশাক (নিম্নাঙ্গের) জড়ো করে, পুরোনো টর্চ লাইট আর টয়লেট সিট গাদা করে। 'সঙ্গীত' বোঝানো হোলো কাগজে ছিঁড়ে ও বোতল ভেঙে। 'পেন্টিং' দেখানো হোলো মেরিলিন মনরো'র পোস্টারে ও টম্যাটো স্যুপের টিন থেকে লেবেল খুলে। 'কবিতা' তৈরি হোলো উদ্ভটভাবে অচেনা কিম্বা চেনা শব্দের শৃঙ্খলে।

তাঁবু, অপ অথবা পপ অথবা আণ্ডার গ্রাউণ্ড কিম্বা ন্যু আর্ট শিল্পের এই নিহিলইজম ও বিদ্রোহ সম্পর্কে হয়তো কোনো কিছুই আলোচিত হোতো না যদি না দেখা যেতো শহরের মধ্যে,

শিক্ষিত মানুষের মধ্যে এটি দ্রুত প্রচারিত হচ্ছে, এবং প্রচারিত হচ্ছে তাদের মধ্যেই যারা শিল্পানুরাগী। শিল্পের বিরুদ্ধে অসম্ভব এক ক্রোধ প্রকাশিত হচ্ছে এই সবের মধ্যে।

এটা এক ধরনের নিও-দাদাইজম। এই শিল্প অতীত ও বর্তমানে শিল্পের জন্যে আগ্রহী নয়। শিল্প এদের কাছে একটা মজার খেলা। এরা এইভাবে খ্যাত হতে চায়, টাকা রোজগার করতে চায়, এবং করেও।

অবশ্য, এস্টাবলিশমেন্টের চেয়ে এরাই বেশি ভালো। কেননা, এদের সব কিছুর মধ্যেই একটি সারল্য ও দুর্ধর্ষ আবেগ জীবন্ত হয়ে থাকে। কিছুদিন আগে একটি নাটকের শেষে যখন মার্কিন পতাকা জ্বালিয়ে দেওয়া হোলো তখন পুলিশ এসে থিয়েটারের লাইসেন্স বাতিল করলো। এরা 'ক্যাট ব্যালো'র লি মারভিনকে পুরস্কার দিয়েছে—রিচার্ড বার্টন, অস্কার ওয়েরনার, রড স্টিগার ও লরেন্স অলিভিয়ার চেয়ে মারভিন অনেক বেশি গুণী হিসেব, 'সাউণ্ড অফ মিউজিক'কে বছরের সেরা হিসেবে চিহ্নিত করেছে, প্যাস্টেরনাকহীন 'ডক্টর জিভাগো'কে সেরা চিত্রনাট্য বলে বাহবা দিয়েছে। পরিবর্তনে বিশ্বাসী আমরা, মার্কিনিরা এখন বুঝতে পারছি, আমরা একটা কিছুর শেষে এসে পড়ছি।

সত্যজিৎ বক্স অফিসের নির্ঘাৎ মৃত্যু। আমাদের চমৎকার সমালোচকরা লেখালেখি করলেও, সত্যজিতের এই ছবি ভালোভাবে দেখানো হয় নি এখানে। এডওয়ার্ড হ্যারিসন সত্যজিতের ছবি কেনার পর দেখলেন যে ছবিগুলো দেখাবার জন্যে হল পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের দেশের অশিক্ষিত, মূর্খ সমালোচকেরা বলেছিলেন, ছবিগুলো বড়ো ধীরগতি, একঘেয়ে এবং বিরক্তিজনক। এরা মুখ লুকোবার জায়গা পায় নি যখন দেখা গেলো ন্যু ইয়র্ক শহরে 'পথের পাঁচালী' চললো দীর্ঘ সাত মাস ধরে।

মার্কিন মুল্লুকে ফ্রান্সের রবার্ট ব্রেসো, কার্ল ড্রিয়ার ও আরমানো ওলমিও কখনো এ সুযোগ তাঁদের জীবনে পান নি। বলতে গেলে, কোনো ব্যবসায়ী ছবি পাত্তা পায় নি তখন।

'রবীন্দ্রনাথ' ও 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছাড়া সত্যজিতের সব ক'টা ছবি আমার ভালো লেগেছে। রেনোয়ার 'রিভার' ছবির ব্যাপারে ১৯৪৯ সালে আমি গিয়েছিলুম ভারতবর্ষে।

১৯৫৫ সালে প্রমোদ পতি, বোম্বের সরকারী ফিল্মস ডিভিসনের প্রযোজক উড়িষ্যায় তাঁর বাড়ি যাওয়ার পথে কলকাতায় 'পথের পাঁচালী' দেখে এসে আমাকে বলেন, ভারতীয় ছবি দেখতে হলে ওই ছবিটা দেখা উচিত। প্রমোদের রুচির প্রতি আস্থা থাকলেও আমি ছবিটা দেখতে খুব একটা উৎসাহী হলুম না। অবিশ্যি অনেকেই আমাকে কথাটা বলেছিলো।

এক বছর পর, রবিবারের এক সকালে বোম্বেতে ছবিটি দেখানো হয়। ছবিটি দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমি মুগ্ধ হলুম। এতদিন পর সত্যিই একটি ছবি দেখলুম যে ছবির সঙ্গে আমার চলচ্চিত্র-চেতনার যোগাযোগ আছে, যাকে নির্দ্বিধায় মহৎ ছবি বলতে পারি।

এই প্রথম একটি ভারতীয় ছবি দেখলুম বিরক্তিহীন, বিভ্রান্তিহীন, ক্লান্তিহীনভাবে। এক বছর লখনৌয়ে থাকার সময় আমি এন্তার ভারতীয় ছবি দেখেছি—কিন্তু এ ছবির যেন তুলনা হয় না।

শ্রীমতী রবার্ট ফ্লেহার্টি ভারতে ছবি করছি বলে খুব আগ্রহী ছিলেন আমার সম্পর্কে। আমেরিকা ছাড়ার পর আমাদের নিয়মিত চিঠি লেখালিখি চলতো। আমি শ্রীমতীকে লিখলুম, 'পথের পাঁচালী'কে যেন ফ্লেহার্টি ফিল্ম সেমিনারে দেখাবার ব্যবস্থা করা হয়, এবং সম্ভব হলে ছবির পরিচালককেও যেন ওখানে নিয়ে যাওয়া হয়।

পরের সেমিনারে, মার্কিন সরকারের ভ্রমণ-সংস্থার সহযোগিতায় সত্যজিৎ 'পথের পাঁচালী' নিয়ে এলেন ওখানে, অর্থাৎ সেমিনারে। এডওয়ার্ড হ্যারিসন 'পথের পাঁচালী' দেখাবার ভার নিলেন সারা মার্কিন মুল্লুকে।

হ্যারিসনের এতো ভালো লেগেছিলো সত্যজিতের ছবি যে সে নানান অসুবিধে ও কষ্ট সহ্য করেও কাজ করতে লাগলো। হ্যারিসনকে ধন্যবাদ, হ্যারিসন না থাকলে এ ছবি আমাদের দেশের লোক কোনোদিনই দেখতে পেতো না।

জনৈক সমালোচক হ্যারিসনকে বলেছিলো, এ ছবি বুঝতে গেলে ধড়ে আর একটা মাথা চাই! আর একজন বলেছিলো, ছবিটা এ্যাম্বাসিতে দেখাও, ওরা গরীব-গুরবোকে দু-চার টাকা দিয়ে সাহায্য করবে।

'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' ভীষণভাবে প্রশংসিত হওয়ার পরও হ্যারিসনকে বেগ পেতে হয়েছিলো 'অপুর সংসার' নিয়ে। একজন সিনেমা হলের মালিক তো মুখের ওপর বলে দিলো, জানি ছবিটা চারটে প্রাইজ পেয়েছে। দারুণ ছবি—কিন্তু ওতে কি একটা ডলারেরও মুখ দেখা যাবে?

তবুও 'পথের পাঁচালী' ফিফথ এভিন্যুর রেকর্ড ভেঙে দিয়েছিলো এক টানা সাত মাস চলে।

'পথের পাঁচালী'র পর থেকেই আমাদের সমালোচকরা দু'ভাগে ভাগ হয়ে যান। কেউ কেউ উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন, আবার কেউ কেউ নিজেদের গণ্ডির বাইরে গিয়েও সত্যজিৎ-প্রতিভাকে তুচ্ছ করে দেখাবার চেষ্টা করলেন।

ন্যুইয়র্ক টাইমসের বসলি ক্রোথার কোনোদিনই হয়তো তার সমালোচনাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। বসলির জন্যে অনেক ক্ষতি হয়েছে সিনেমাহলের মালিকদের আর এ যাবৎ বসলির কথাতেই সিনেমার ব্যবসা চলতো।

বসলি লিখেছিলো:

হলিউডের ছবি থেকে একেবারে আলাদা, যারা ঘণ্টা দুই ধৈর্য ধরে বসে ছবিটি দেখবে তারা কিছুটা আরাম পাবে কয়েকটি অত্যন্ত কোমল প্রয়োগে···বাঁধুনিহীন, ঢিলে-ঢালা গল্পটার মধ্যে একটি মাত্র গভীর ইংগিত আছে, ইংগিতটি হোলো দারিদ্র্যে ভালোবাসা নিশ্চিহ্ন হয় না, সব থেকে বেদনার্ত মানুষেরও আনন্দ পাওয়ার একটি নিজস্ব পৃথিবী আছে।

এটাকে কোনোক্রমেই অসতর্ক সমালোচনা বলা যায় না। বলা যায় নিন্দাবাদ করার চক্রান্ত। নির্লজ্জতা।

বসলি আরো লিখেছিলো :

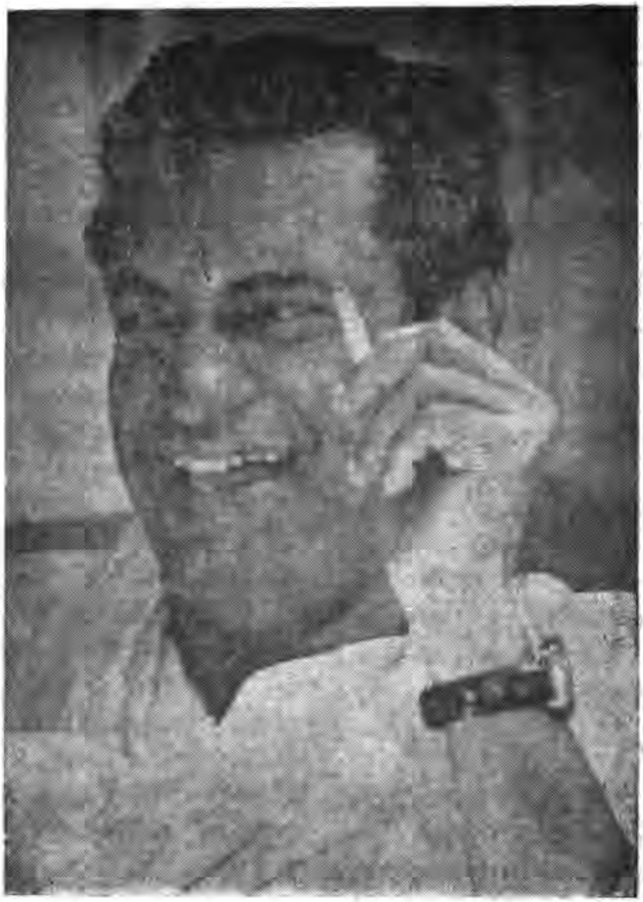
সত্যজিতের এটা যে প্রথম ছবি তা সহজেই বোঝা যায়। এত ঢিলে-ঢালা গাঁথুনি যে হলিউডের রাফ কাটও এর চেয়ে ভালো।

এই সমালোচনা সম্পর্কে মন্তব্য করার কিছু নেই, কেননা এই সমালোচনার জন্যেই বসলি কুখ্যাত হয়েছে আর সত্যজিৎ বিখ্যাত হয়েছেন। সত্যজিৎকে সমর্থনের জন্যে অন্যান্য সমালোচক কলম ধরেছেন।

'পথের পাঁচালী'তে জবর ধাক্কা খাওয়ার পর বসলি নিজেকে একটু সামলে নেওয়ার চেষ্টা করেছে 'অপরাজিত'র সমালোচনায়। যদিও হলিউডের মতো নয়, তবুও বসলি বলেছে :

চিত্রকল্প ভাবনার সঙ্গে দুর্লভ ভাব, ভারতীয় চরিত্রের সহানুভূতিময় চিত্রণ, ছবিটির একটি সম্মোহন শক্তি আছে স্থির ধীর দর্শকদের জন্যে। যদি সে এক ঘণ্টা আটচল্লিশ মিনিট চুপ করে বসে থাকতে পারে, তাদের চোখের ওপর দিয়ে আশ্চর্য কয়েকটা সাদা-কালো ছবি যাতায়াত করবে।

নুাইঅর্কে 'পথের পাঁচালী'র বিরাট সাফল্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু কিছু ব্যবসায়ী ছবি দেখানো হলের মালিকরাও উৎসাহী হয়ে ওঠেন। বোস্টনের ভায়োলা বারলিন তাঁর হলের ইংলিশ কমেডির শৃঙ্খল বাদ দিয়ে 'পথের



পাঁচালী'কে সুযোগ দেন। দেখা গেলো, শ্রীমতী বার্লিন 'পথের পাঁচালী' দেখিয়ে গিনেস কমেডির মতো বক্স-অফিস গোছাতে পারেন নি। এরপর শ্রীমতী বার্লিন 'অপরাজিত' ছবি নেন নি।

বোস্টনের ব্রাটল সিনেমার মালিক সি হারডে। হারডে অত্যন্ত রুচিশীল প্রদর্শক। সত্যজিতের ছবি এখানেও দু একদিন দেখানো হয় মাঝে মাঝে। এই জাতীয় 'আর্ট' হাউসের ছবি সাধারণত ছাত্র ও যথার্থ চলচ্চিত্রানুরাগীদের জন্যে চলে।

মার্কিন মুলুকের ছাত্র ও চলচ্চিত্রানুরাগীরা সত্যজিতের ট্রিলজির খবর রাখলেও জনসাধারণ তার বিন্দু বিসর্গও খবর রাখে না। এমন কি, ট্রিলজির পর সত্যজিৎ যে কি কি ছবি করেছেন, আচ্ছা-আচ্ছা চলচ্চিত্রানুরাগীরাও সে খবর রাখেন নি।

হয় সত্যজিৎ সময়কে ফেলে অনেক এগিয়ে আছেন, নয় আমাদের দেশের দর্শকদের সেই শিল্প-মানসিকতা নেই যে মানসিকতা দিয়ে সত্যজিতের ছবি গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

যে সব ভারতীয়রা অথবা ভারতীয় ছাত্ররা মার্কিন মুলুকে থাকেন, তাঁরা কোনোদিনই সত্যজিতের ছবি দেখেন না অথবা দেখান না। এরা সব সময়েই বক্স-অফিস-হিট-করা ভারতীয় ছবি আমদানি করেন এখানে, কেননা ওই সব ছবিতে কিছু টাকাও আসে আর হল ভর্তি ভারতীয় জড়ো করা যায়।

সত্যজিতের ছবি দেখান না কেন,

জিজ্ঞেস করলে এরা ঈষৎ বিরক্ত হয় ও বিব্রত বোধ করে। এখানকার বেশির ভাগ ভারতীয়রা আসে ভারতবর্ষের নানা শহর থেকে, আসে এখান থেকে ডিগ্রি নেওয়ার জন্যে। এরা কেউই গ্রামে যায় নি। সত্যজিতের ছবি দেখলে এরা স্বভাবতই একটু বেকায়দায় পড়ে। ভালো ছবি সম্বন্ধে এদের কোন জ্ঞান-গম্যি নেই, সাধারণ ভারতীয় ছবিই এদের জন্যে যথেষ্ট।

এদের অবস্থা আরো খারাপ হয় যখন এরা দেখে সত্যজিতের ছবি এদেশে খুব প্রশংসিত হচ্ছে। ভারতবর্ষের বার বার নাম উল্লেখ হচ্ছে শুনে এরা গর্বে একটু বুক ফোলায়, অতীতকালের ভারতবর্ষের গল্প শোনায় এবং তারপরই বলে, ভারতবর্ষ ওই ট্রিলজির মতো নয়। একশো বছর আগের ঘটনা নিয়ে লেখা ওই গল্পের সঙ্গে ভারতের একটুও মিল নেই আজ। অন্য ছবি? ওগুলো ইতিহাসভিত্তিক…

জর্জ স্টোনি, অল মাই বেবিজ-এর পরিচালক, ভীষণভাবে সত্যজিৎ-ভক্ত। তিনি স্ট্যানফোর্ড ইউনিভারসিটিতে 'ফিল্ম এসথেটিক্স'-এর ক্লাস নিয়েছেন শুধুমাত্র সত্যজিতের ছবি সম্বল করে।

বসলি ও এসকয়ার পত্রিকার ডুইট ম্যাকডোনল্ড ছাড়া আমাদের দেশের প্রতিটি সমালোচক সত্যজিতের ছবি পছন্দ করেছেন। ম্যাকডোনাল্ডের নমুনা: 'পথের পাঁচালী' গ্রামের একটি পরিবার সম্পর্কে, অপু শহরের একটি তরুণ লেখক সম্পর্কে—খুবই জটিল বিষয়, ঠিক বুঝলাম না রায় সামলাতে পেরেছেন কিনা।

স্ট্যানলি কাউফম্যান নিউ রিপাবলিক পত্রিকায় লিখে এসেছেন ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল অবধি। এখন তিনি ন্যুইঅর্ক টাইমসের সঙ্গে যুক্ত। এমনিতে ভদ্রলোকের মতামতগুলো সুস্থ। তিনি 'পথের পাঁচালী'র আলোচনা করেছিলেন চোদ্দ লাইনের মধ্যে। তাঁর বক্তব্য: 'পথের পাঁচালী'কে একটু বেশি-বেশি প্রশংসা করা হচ্ছে। এটাকে আরো ৫% ছোটো করা যেতো। গল্পটা সহজ—প্রায় বস্তাপচা। নাটকীয় তথ্যচিত্র হিসেবে হয়তো ভালো হোতো।

বসলির মতো কাউফম্যানও নিজেকে সামলে নেন 'অপরাজিত'র সমালোচনায়। ছিয়াশি লাইনের সমালোচনায় তিনি বলেন:

'অপরাজিত' দেখার পর মনে হচ্ছে 'পথের পাঁচালী' নিঃসন্দেহ ভালো ছবি। রায় ন্যাশনাল ফিল্মস এপিকের কায়দায় যে ছবি করে যাচ্ছেন তা সোভিয়েতের গর্কি ট্রিলজির (১৯৩৮-৪০) সঙ্গে তুলনীয়। ফ্লেহার্টির 'নানুক' ও 'মোয়ানা'র সঙ্গেও এর তুলনা চলতে পারে।…রায়ের শিল্প সত্তা মহান পর্যায়ের। স্বীকার করতে বাধা নেই, এই ছবির মাধ্যমে রায় সমকালীন পরিচালকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

ড্যানিয়েল ট্যালবট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বজনস্বীকৃত চিত্রবোদ্ধা 'প্রগ্রেসিভ' কাগজে প্রবন্ধ লিখে বলেছিলেন, হলিউডের ছবি ক্রমশই স্থূল থেকে স্থূলতর হচ্ছে। 'অপুর সংসার'কে মাস্টারপিস বললে কোনো রকম অত্যুক্তি হয় না। 'বাইসিকল থিফে'র পর অন্য কোনো ছবি আমাকে এইভাবে নাড়া দেয় নি। নতুন যুগের শ্রেষ্ঠ পরিচালক সত্যজিৎ মানবতাবাদী, বাস্তববাদী ও রোমান্টিক। সাধারণ মানুষের কথা সাধারণ ঘটনা দিয়ে যেভাবে বোঝাতে পারেন তা অন্য কোন পরিচালক পারেন কিনা আমার জানা নেই। তিনি ন্যায়শাস্ত্রীয় ভঙ্গিতে তাঁর ধারণা এগিয়ে দেন না, এগিয়ে দেন অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে, যার মধ্যে দর্শক গভীর সত্য আবিষ্কার করেন।…এই ছবির সেলুলয়েডের প্রতিটি ইঙ্গিতে প্রেরণা-পাওয়া একটি একটি মানুষের কাজ দেখতে পাওয়া যায়।

ক্রিস্টিয়ান সায়েন্স মনিটারে জন বোফোর্ড লিখেছিলেন: মানবিকতার পরশপাথর ছুঁইয়ে রায় যে ছবি করেন তা দূরত্ব ও বিদেশী ব্যাপারগুলির মধ্যে এক ধরনের আত্মীয়তা সৃষ্টি করে। সর্বজনীনভাবে আমাদের কাছে ধরা দেয়।

মনিটরের মেলভিন ম্যাডক্স লিখেছিলেন, সত্যজিতের 'দুই কন্যা'র তুলনা মেলা ভার।

'সাটারডে রিভ্যু'র অর্থার নাইট সত্যজিতের যে কোনো ছবি সম্পর্কেই সুচিন্তিত আলোচনা করেন। তিনি 'অপরাজিত' সম্পর্কে লিখেছিলেন:

গোড়া থেকেই দেখা যায় চরিত্রের প্রতি রায়ের একটা ভাবনা থাকে। সাধারণ ঘটনাকে তিনি এমনভাবে শিল্পায়িত করেন যে তা মুহূর্তে ইমেজধর্মী কবিতায় পরিণত হয়, কিন্তু বাস্তববোধ এতটুকু মলিন হয় না।

প্রসঙ্গত, রিচার্ড গ্রিফিথ ও পল গ্রিম*—এই দুজনেও সত্যজিতের প্রতিটি ছবি সম্বন্ধে সচেতন ও আগ্রহী।

পল গ্রিম নির্দ্বিধায় বলেছেন, শিল্পের দিক থেকে ভারতীয় চলচ্চিত্রের অবস্থা হলিউডের চেয়ে অন্তত ত্রিশ বছর পেছনে। সত্যজিৎকে সেইজন্যে ভারতীয় চলচ্চিত্র ঠিক মতো গ্রহণ করতে পারছে না। শহরের বিদগ্ধতা ও গ্রামের সহজ সারল্যকে একসঙ্গে খুশি করা সহজ ব্যাপার নয়। সত্যজিৎ আমেরিকায় যতটা, ভারতবর্ষে সম্ভবত ততটা বিখ্যাত নন।

লস এ্যাঞ্জেলসের আর্ট ফিল্ম পাবলিকেসনস যে-সব প্রোগ্রাম নোটস প্রকাশ করে তাতে ইকিরা, স্নসাইন, জাঁ ভিগো ইত্যাদির আলোচনা থাকে। এরা সত্যজিৎ সম্পর্কে লিখেছে:

রায় নিজেই চিত্রনাট্য রচনা করেন এবং পৃথিবীর মিতব্যয়ী পরিচালকদের মধ্যে অন্যতম। একটা কিংবা দুটো

---

* এই সংখ্যায় পল গ্রিমের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

সটে, একটি অথবা দুটি সংলাপে যে কোন ঘটনাকে তিনি যথার্থভাবে ফুটিয়ে তোলেন। মাত্রার মধ্যে কবোষ্ণতা, চরিত্র ও আবেগ এত নিখুঁত এবং নৈর্ব্যক্তিকভাবে প্রকাশ করেন যে মনেই হবে না এগুলি প্রকাশের অন্য কোনো পন্থা থাকতে পারে। 'পথের পাঁচালী' কালের সীমা পার হওয়া একটি আন্তর্জাতিক ছবি। এই গল্প ও চরিত্র পৃথিবীর যে কোনো মাটিতেই সম্ভব। গর্কি ট্রিলজির চেয়েও রায় অনেক উর্ধে। পৃথিবীর মাস্টারপিস ছবির তালিকায় অপু থাকবে।

পলিন কেইল, এদেশের সম্মানিতা সমালোচিকাদের একজন, তাঁর 'আই লস্ট এ্যাট দি মুভিজ' সমালোচনা-সংকলনে লিখেছেন:

অপুর গল্প তিনটি মাস্টারপিস ও বহু প্রশংসিত। এই ছবি তিনটি আমেরিকান দর্শকরা খুব কম দেখেছে। ওরা বোধ হয় ডেভিস এ্যাণ্ড লিসা অনেক বেশি দেখেছে। 'দেবী' হয়তো আরো কম দেখেছে। বার্গম্যানও প্রথম দিকে আমেরিকান দর্শকদের জয় করতে পারেন নি, কিন্তু শেষ অবধি জয় করে ছেড়েছেন। সত্যজিৎ পারবেন না কেন?

একটা ভুল ধারণা আছে। সত্যজিৎ নাকি 'আদিম' শিল্পী (এতে অবশ্য সত্যজিতের সুবিধে হয়েছে) কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে আর্ট ইত্যাদির ব্যাপারে সত্যজিৎ অন্য রকম··· (এই জন্যেই অসুবিধে হচ্ছে এখন) সত্যজিৎ যদি 'আদিম' শিল্পী হন, তাহলে এসকিমোদের জীবন নিয়ে যে ছবি, 'নানুক অফ দ্য নর্থ'-এর স্রষ্টা রবার্ট ফ্লেহার্টিও আদিম।

সত্যজিৎ শুরুই করেছেন মাস্টারপিস দিয়ে। অপু না পাওয়া গেলে আমরা নিশ্চয়ই 'দেবী'কে মাস্টারপিস, ভারতের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র কীর্তি হিসেবে চিহ্নিত করতাম। দেবী ও অপু না পেলে 'দুই কন্যা'র 'পোস্টমাস্টার'কে মাস্টারপিস হিসেবে স্বীকৃতি দিতাম।

সত্যজিৎ আমাদের কাছে (হয়তো ওদেশেও) মাঝে মাঝে সামান্য বিরক্তিকর, কিন্তু কোন মহৎ শিল্পী বিরক্তিকর নন? ডকুমেন্টারি অথবা ফিল্মে আমরা যা কোনোদিনই পেতাম না, সত্যজিৎ আমাদের সেই সমৃদ্ধি দিয়েছেন। কিন্তু এই সমৃদ্ধিতে অনভ্যস্ত বলে আমরা ক্লান্তি বোধ করি, ভালো উপন্যাস কিংবা এপিক কাব্য পড়তে বসলেও আমাদের এই ধরনের ক্লান্তি আসে, বিরক্তি আসে।

ছবি তৈরির ব্যাপারে জাপানের পরই ভারত, কিন্তু সত্যজিৎ একমাত্র ভারতীয় পরিচালক, এখনও পর্যন্ত যিনি কারুর সঙ্গে তুলনীয় নন। যে আর্থিক অসুবিধের মধ্যে তাঁকে কাজ করতে হয়, তাঁর বিষয়বস্তুর ওপর যেভাবে সরকারী নেকনজর পড়ে, এবং যে জনপ্রিয় উদাসীনতার সঙ্গে তাঁর ছবি দেখে লোকে, এগুলি যে কোনো চিত্র পরিচালকের পক্ষে ঈর্ষার ব্যাপার।

ভারতবর্ষে এখনো অবধি মূল্যবোধের কোনো ছবি সত্যজিৎ ছাড়া আর কেউ করেন নি। কাজেই পুরো দেশটা আর তার সংস্কৃতিকে প্রকাশ করার সীমিত দায়িত্ব পড়েছে সত্যজিতের ওপর। অত্যন্ত বিশাল ও প্রাচীন এক কাজে তিনি ব্যস্ত।

বাইবেলের গল্প নিয়ে যে হলিউডি পরিচালক তিনবার, ছ'বার কিম্বা ন'বার ছবি করেছেন তিনিও সত্যজিতের কাছে তুচ্ছ, তা সে যত টাকাই তিনি খরচ করুন না কেন। রেনোয়া ও ডি সিকার মতো সত্যজিৎ জীবনকে দেখেন, সে জীবন খারাপই হোক আর ভালোই হোক।

এ্যাডুকেশনাল ফিল্ম লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন আমেরিকান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের উদ্যোক্তা। সত্যজিতের দলিল-চিত্র 'রবীন্দ্রনাথ' সম্পর্কে ওদের মন্তব্য:

কবির নৃত্যনাট্য, পেন্টিং-এর ছবি, জালিওয়ানাবাগ, শান্তিনিকেতন, কবির কণ্ঠস্বর—অসাধারণ। নেপথ্য সংগীত ও ফোটোগ্রাফিও চমৎকার।

'সেক্সপীয়ারওয়ালা' ও 'হাউস হোলডার' ছবি অনেকের প্রশংসা পেলেও, যাঁদের ভারতবর্ষে থাকার অভিজ্ঞতা ও ভারতবর্ষকে পছন্দ করার মন আছে তাঁরা জানেন ছবি দুটি কতটা অসার এবং আমেরিকায় বক্স-অফিস করার জন্যে কিভাবে তৈরি করা হয়েছে।

সত্যজিৎ যে একজন উঁচুদরের গল্পকার তা বোঝা যায় 'দেবী, 'জলসাঘর', 'দুই কন্যা', 'মহানগর' ও 'চারুলতা' দেখলে।

আঁদ্রে জিদের সিমফনি প্যাসটোরালের সঙ্গে 'দেবী', চেকভের চেরি অর্কার্ডের সঙ্গে 'জলসাঘর', 'দুই কন্যা'র ও 'মহানগরে'র সঙ্গে ইটালিয়ান নিও-রিয়ালিস্ট ফিল্ম সমগোত্রীয়। 'চারুলতা' সম্বন্ধে রিচমণ্ড রাউট লিখেছিলেন:

'চারুলতা' অত্যন্ত স্ফূর্ত ও কোমল, 'মহানগর' ছিলো নরম ও মজার। 'চারুলতা' আরো গভীরে প্রবেশ করে, ট্র্যাজেডির প্রায় কাছাকাছি পৌঁছয়। চরিত্রচিত্রণ অত্যন্ত সমৃদ্ধ। প্রতিটি দৃশ্যে সত্যজিৎ আশ্চর্য উজ্জ্বল এক কোমলতা উপস্থিত করেছেন। সত্যজিৎ এযাবৎ যতো ছবি করেছেন, তার মধ্যে এই ছবিটি সূর্যের আলোর মতো পরিচ্ছন্ন।

আমরা সত্যজিৎকে রেনোয়া, ডি সিকা, ড্রিয়ার, ডভঝেনকোর সঙ্গে একাসনে বসিয়েছি। হলিউডের চোখ ধাঁধানো আলো সত্যজিতের' নন্দনতত্ত্বের কাছে কানা হয়ে যাবে একদিন, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। হয়তো এর মধ্যে একদিন ভারতবর্ষের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার জন্যে কেউ চলে যাবে, দেখে আসবে, যাচাই করে আসবে সত্যজিতের ছবিতে কতখানি সততা ও সত্য প্রকাশিত হয়।

রবিশঙ্করের চোখে সঙ্গীতকার সত্যজিৎ

সত্যজিৎ রায় আমাদের পরিবারের অনেক দিনের বন্ধু মানুষ। তিনি যখন 'পথের পাঁচালীর' সঙ্গীত রচনা করবার জন্যে আমার কাছে এলেন, আমি না করতে পারলাম না। সত্যজিৎ আমাকে ছবির রাশ প্রিন্ট দেখালেন, সত্যি বলতে কী, দেখে ভাবাবেগে আমি অভিভূত হলাম। আমার মাথাতে তখনই যেন বিষণ্ণ সঙ্গীতের অনুরণন অনুভব করলাম। বলতে কী তখনই মাত্র সাড়ে চার ঘণ্টা সময়ের মধ্যে গোটা ছবির নেপথ্য সঙ্গীতের মানস-লিপি তৈরী হয়ে গেল।

রাশ দেখেই আমি বুঝেছিলাম এ ছবি বিরাট শিল্পকর্ম বলে স্বীকৃত হবে। সত্যজিতের আরও অনেক ছবি দেখেছি, কিন্তু 'পথের পাঁচালী'র মত অমন প্রাঞ্জল, স্বচ্ছন্দ গতি কোনটাতেই পাই নি। সব টুকরো টুকরো কাজ এমন অখণ্ড একে বিলীন হয়েছে যা অনবদ্য।

সত্যজিৎ ছবির সঙ্গীত রচনায় অধিকারী। তিনি জানেন তিনি কী চান। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে তাঁর সবিশেষ শিক্ষা আছে, বিশেষতঃ পেশাদার শিল্পীদের মতই পিয়ানো বাজাতে পারেন। ছবি ও সঙ্গীতে সমান নৈপুণ্য এবং অপরিসীম জ্ঞান লক্ষ্য করেছি চার্লি চ্যাপলিনের মধ্যে। 'লাইম লাইট' ছবিতে চ্যাপলিন রচিত সঙ্গীত অসাধারণ। আর একজনের নামও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, তিনি নোয়েল কাওয়ার্ড। ভারতীয় চিত্রে সঙ্গীত এখনও ঠিক ওই পর্যায়ে উঠতে পারে নি।

অনেকেই এদেশে সঙ্গীত পরিচালকদের কাজকর্ম সম্পর্কে আমায় প্রশ্ন করেন, মতামত দেওয়া শক্ত। সঙ্গীত পরিচালক সঙ্গীত পরিচালকে অবশ্যই তফাৎ আছে। একটা মোটরের হর্ণ, পাখিদের কিচির-মিচির, অখণ্ড নীরবতা কখনও কখনও প্রচণ্ড সঙ্গীতের এফেক্ট সৃষ্টি করতে পারে। সেখানে যন্ত্রের কোন সঙ্গীত, কোন অর্কেস্ট্রা পৌঁছতে পারে না। লক্ষ্য করছি, ছবিতে ভারতীয় মার্গ-সঙ্গীতের অপব্যবহার হচ্ছে এবং এমন অপ্রযুক্ত যে হাস্যকর হয়ে পড়ে। তানসেন তানসেনের মতই গাইতেন, তাঁর নিজস্ব একটা ভঙ্গী ছিল; বড়ে গোলাম আলি খাঁ তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে গান। যখন দেখি 'মুঘলে আজম' ছবিতে তানসেনের গলায় গোলাম আলি খাঁর গান, তখন অস্বস্তি বোধ করি। এমন আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

এসব ব্যাপারে সত্যজিৎ অত্যন্ত সতর্ক। ওঁর সঙ্গীত রচনা আমার ভাল লাগে, ভীষণ ভাল লেগেছে সর্ট ফিল্ম 'টু'-এর নেপথ্য সঙ্গীত। দুটি ছেলের প্রচণ্ড কোলাহল ও পারস্পরিক আক্রোশকে তিনি শুধুমাত্র ধ্বনির মধ্যে দিয়ে যেভাবে প্রকাশ করেছেন, তা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

শুধু ছবির কথা বললে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ও 'মহানগর' আমার ভাল লেগেছে, কিন্তু এখনও 'পথের পাঁচালী'ই মনে হয় ওঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

অনেকে প্রশ্ন করেন, কোন বাংলা ছবিতে সঙ্গীত রচনা করে আমি সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছি। 'পথের পাঁচালী' অবশ্যই—টিন, বাক্স, পেয়ালা, পিরিচ বাজিয়ে নতুন রকমের একটা এক্সপেরিমেন্ট করা গেছে। উৎপল দত্তের 'মেঘ' আর 'ঘুম ভাঙার গান' দুটোতে কাজ করেও খুশি হয়েছি।

নেপথ্যের আমি: সংগ্রাম ও প্রতিষ্ঠা

[জর্জেস সাদুলের সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের আলাপচারীর বিবরণ, সত্যজিতের শৈশব থেকে প্রতিষ্ঠা ও যশের কাল পর্যন্ত আত্মকথন-ভিত্তিক পরিক্রমার ফলশ্রুতি একটি রচনা বেরিয়েছিল CAHIERS DU CINEMA পত্রিকায়। সেটি শ্রীরায়ের শিল্পীমনের বিবর্তনের একটি নির্ভরযোগ্য দলিল বলে বিবেচিত। রচনাটির বাংলা রূপান্তর এখানে প্রকাশিত হল।]

আমার জন্ম কলকাতায়, ১৯২১ সালে। আমার ঠাকুর্দা উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন বিদ্যানুরাগী, সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞ মানুষ। সেকালের ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, স্টিরিও-টাইপিং প্রসেসের উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন, ছোটদের জন্যে পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। আমার বাবা সুকুমার রায় বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত সব বই লিখেছেন, কবিতা রচনা করেছেন। আমার ঠাকুর্দার মৃত্যুর পর বাবাই হলেন ছাপাখানার পরিচালক। মাত্র ৩৯ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়, আমি তখন দুই বছরের শিশু। সব পারিবারিক উদ্যোগ ভেঙে পড়ার উপক্রম, আমার ছয় বছর বয়সের সময় তা দেউলে হয়ে গেল। আমার মা আমাকে নিয়ে আমাদের বাড়ি ছেড়ে মামাবাড়িতে এসে উঠলেন। জীবিকার তাগিদে মা চাকরি নিলেন ইস্কুলে, আমাকে মানুষ করার জন্যে সূচিশিল্প করেও কিছু রোজগার করতেন। আমি মামাবাড়িতেই বড় হলাম। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে ভর্তি হলাম সে-সময়কার বাংলাদেশের সেরা কলেজ প্রেসিডেন্সিতে, ১৯৪০-এ ইকনমিকস নিয়ে বি-এ পাশ করলাম।

ছেলেবেলা থেকেই আমি ছবি আঁকতে, রং করতে ভালবাসতাম, তাই বি-এ পাশ করেই গেলাম শান্তিনিকেতনে, ফাইন আর্টস শিখতে, রবীন্দ্রনাথ তখন বেঁচে। ওখানে আমি আড়াই বছর কাটিয়েছি। শেষ বছরের ডিসেম্বরে কলকাতায় ফিরলাম। ফাইন আর্টসের চর্চার সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার কথাও ভাবতে হল। ১৯৪৩-এ, আমার বয়স তখন বাইশ, আর্টিস্ট হিসেবে ঢুকলাম এক বিজ্ঞাপন এজেন্সিতে। দশ বছর সেখানে কাজ করেছি। শেষ পর্যন্ত আর্ট ডিরেক্টর অবধি হয়েছি।

ছেলেবেলা থেকেই সিনেমা আমাকে রোমাঞ্চিত করেছে, ঐ ছিল আমার হবি, ১৯৪৭-এ আরো কয়েকজনের সঙ্গে মিলে করলাম ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি। আমি একই ছবি তিনবার, চারবার, পাঁচবার দেখতাম; দেখতাম আর 'নোট' করতাম। আমরা 'পটেমকিন'-এর একটা প্রিণ্ট পেয়েছিলাম, সে-ছবি পঁচিশ তিরিশবার দেখেছি।

ইংরেজিতে পড়তাম পুডভকিন, পল রোথা, ভ্লাদিমির নিলজেন আর আইজেনস্টাইনের লেখা, পড়তাম আর বিস্মিত হতাম; তখন ১৯৪৭ সাল, এঁদের চলচ্চিত্র-চেতনা আমার কাছে ছিল নতুন আবিষ্কারের মত। ঐ সময় কোন্ কোন্ ছবি আমার মনে সবচেয়ে রেখাপাত করেছে? ফ্রিটজ ল্যাঙের 'এ্যামেরিকান পিরিয়ড', 'মেট্রোপলিস', 'ডাঃ মবিউজ'। এ ছাড়া জন ফোর্ড, ফ্যাঙ্ক কাপরা, জন হাউসটন, লুবিস, বিলি ওয়াইলডার প্রভৃতির ছবি। রেন ক্লেয়ারের নির্বাক ছবি (দি ইটালিয়ান স্ট্র হ্যাট) ও মার্সেল কার্নের ছবি আমার কাছে খুব উঁচু দরের মনে হয়েছিল।

যুদ্ধের আগে অবেল গান্‌স-এর অনেক ছবি দেখেছি, রেমণ্ড বার্নার্ড-এর লে মিজারেবলস্ শিশুকালে আমার মনে দারুণ ছাপ রেখেছিল, এবং আমি হ্যারি বর-কে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অভি-

নেতা মনে করতাম। যুদ্ধের পরে ইউরোপীয় ছবি বিরল হয়ে পড়ল, কিছু সোভিয়েট ফিল্ম আমাকে দারুণভাবে নাড়া দিল : আইভান দ্য টেরিবল, আলেকজাণ্ডার নেভস্কি, স্টর্ম ওভার এশিয়া, প্রফেসর ম্যামলক। পরে পুডভকিনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়।

মার্কিন বিষয়বস্তুর প্রতি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের আলোকপাতের জন্যে রেনোয়ার 'দি সাউদার্নার' আমার ভাল লাগে। যখন শুনলাম 'দি রিভার' ছবি নির্মাণ সূত্রে তিনি বাংলাদেশে এসেছেন আমি দেখা করতে গেলাম। নিজের পরিচয় দিলাম চিত্রানুরাগী ও ফিল্ম সোসাইটির সংগঠক বলে। রেনোয়া আমাকে উৎসাহ দিলেন। কিন্তু যে বিজ্ঞাপন সংস্থায় আমি চাকরি করতাম ১৯৫০-এ তাঁরা আমাকে লণ্ডন অফিসে বদলি করে দিলেন।

ঐ আমার প্রথম ইউরোপে থাকা। কলকাতায় যে-সব ছবি দেখতে পাই নি এমন পঁচানব্বইটি ছবি দেখলাম পাঁচ মাসে। যেদিন লণ্ডনে পৌঁছলাম সেদিনই সন্ধ্যায় একসঙ্গে দুটো ছবি দেখলাম কার্জন সিনেমায় : 'এ নাইট এ্যাট দি অপেরা' ও 'দি বাইসাইকেল থিফ'। ঐ ছবি দেখেই আমি টের পেলাম স্টুডিওর বাইরে শুধু অপেশাদার অভিনেতা নিয়ে পরিচালক কী ঘটাতে পারেন। ভাবলাম যা ইটালিতে হতে পারে, তা কলকাতাতেও হতে পারে, সাউণ্ড রেকর্ডিংয়ের অসুবিধে সত্ত্বেও। এর পরে দেখলাম 'মিরাকল অব মিলান', ছবির প্রথম দিকটা আমার দারুণ ভালো লেগেছিল। এরও অনেক পরে, 'পথের পাঁচালী'র পরে, প্যারিসে আমি রোসেলিনিকে আবিষ্কার করি, ভিসকন্তির 'লে তেরা ত্রেমা'-ও তখনকার অভিজ্ঞতা। লণ্ডনে 'নানুক অব দি নর্থ' ও 'লুসিয়ানা স্টোরি' দেখে আমি রবার্ট ফ্লেহার্টির মর্যাদা উপলব্ধি করি।

সোভিয়েতের মধ্যে ডভঝেনস্কিকে পেলাম—প্রতিভাবান পরিচালক, বিরাট কবি, দুর্ভাগ্যবশত মানুষটির সম্যক ও ব্যাপক পরিচিতি নেই। ডনস্কয়ির 'চাইল্ডহুড অব ম্যাক্সিম গোর্কি' দেখে প্রচুর আনন্দ পেয়েছি, পরে অনেকেই জানতে চেয়েছেন 'পথের পাঁচালী'তে ঐ ছবির দ্বারা আমি প্রভাবিত কিনা। আমার ধারণা, আমি তা হই নি। আমি ডনস্কয়ির মত ছবি করতে চাই নি। আগে কি ওঁরা বলতেন না বিভূতিভূষণ জাঁ ক্রিস্তফের দ্বারা প্রভাবিত? অথচ 'পথের পাঁচালী' লেখার সময় বিভূতিভূষণ রোমা রোঁলার নাম পর্যন্ত জানতেন না।

লণ্ডনে 'দি বাইসাইকেল থিফ' দেখে আমি স্থির করলাম নিও-রিয়ালিস্টিক মেথডে 'পথের পাঁচালী' ছবি করব। ১৯৫০-এর অক্টোবরে কলকাতায় ফিরেই আমার চিত্রনাট্যের খসড়া তৈরি করে ফেলি, অনেক প্রডিউসারকে আমার আইডিয়া বোঝালাম, তাঁদের আকৃষ্ট করার জন্যে চিত্রনাট্যের প্রায় পাঁচশ' রেখাচিত্র এঁকেছিলাম, কিন্তু সবই বৃথা গেল, কেউ ব্যাপারটাতে গুরুত্ব দিলেন না। এমন কি তিনের দশকে যাঁরা শ্রেষ্ঠ বাংলাচিত্রের প্রযোজনার মূলে সেই নিউ থিয়েটার্সও না।

তখন আমি ছবির কাজ আরম্ভ করলাম আমার দুই বন্ধুকে নিয়ে, দুজনেই তখন এ্যামেচার, একজন সুব্রত মিত্র, সে হল ক্যামেরাম্যান, আর একজন বংশী চন্দ্রগুপ্ত, সেট ডিজাইনার, সেই 'পথের পাঁচালী' থেকে আজ পর্যন্ত আমার সব ছবির সেটই ওঁর। আমরা তিনজনে একটা ষোলো মিমি ক্যামেরা নিয়ে যত্রতত্র পরীক্ষামূলক সুটিং সুরু করে দিলাম, উদ্দেশ্য, কাজটা আমাদের দ্বারা হবে কিনা তাই দেখা। যখন বুঝলাম আমরা ছবি করতে পারব তখন এল টাকাকড়ির চিন্তা, কম করে কুড়ি হাজার টাকা লাগবে ছবিটা করতে। টাকা চাই। সুতরাং উদ্যোগ বন্ধ রাখতে হল সাময়িকভাবে।

১৯৫২ সালে স্থির করলাম, যেমন করে হোক এ ছবি আমি করবই। একটা লাইফ ইন্সিওরেন্স থেকে সাত হাজার টাকা ধার নিলাম, নন প্রফেসনাল লোক নিয়ে সুটিং সুরু করলাম। ছোট মেয়েটিকে পেয়েছিলাম একটি স্কুলে, আর তাদের মায়ের ভূমিকা যিনি করেছেন সেই ভদ্রমহিলাকে একটি স্টোরে, সেখানে তিনি চাকরি করতেন। আমিও চাকরি করছি। সুতরাং সপ্তাহে শুধু শনিবার আর রবিবার আমরা ছবির কাজ করতে পারতাম। যা শট নিতাম তা-ও এডিট করা সম্ভব হত না, ফলে কাউকে দেখাতেও পারতাম না। ছবির খরচ চালাবার জন্যে আমি আমার লাইব্রেরির বইপত্র বেচে দিলাম, আর্টের বইগুলোও, বেচলাম মায়ের গয়না, স্ত্রীর গয়না। সাকুল্যে হাজার ছয়েক টাকা হল। বাদছাদ দিয়ে তাতে চল্লিশ মিনিটের ছবি হয়েছে। সেটসেটিং, এ্যাক্টর, মেক-আপ ছাড়া সামান্য টাকায় যতটা করা গেছে ততটা দেখান চলে। এইটুকু দেখে আমাদের ব্যাক করবে এমন কাউকে পাওয়া গেল না, আবার বছর খানেক কাজ বন্ধ রাখতে হল। আমি হতোদ্যম হয়ে পড়েছি, ছবি-টবি আর করবই না ভাবছি, এমন সময় আমার মা তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বি সি রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ কথাবার্তায় আমাদের একটা সুযোগ করে দিলেন। আগে থেকে ডক্টর রায়ের সঙ্গে আমার মায়ের চেনাজানা ছিল। বিধান রায় আমাদের ছবি দেখলেন, দেখে ওটা শেষ করার জন্যে দশ হাজার টাকার সরকারী খয়রাতের ব্যবস্থা করে দিলেন। 'পথের পাঁচালী' তখনও শেষ হয় নি, আমি যেখানে চাকরি করি সেই বিজ্ঞাপন এজেন্সির একজন কর্মকর্তা ডি আর নিকলসন কয়েকটি সিকোয়েন্স দেখলেন, তাঁর এত ভাল লাগল যে



জর্জ সাদুলের
সঙ্গে সত্যজিৎ রায়

তিনি ছবির কাজের জন্যে আমাকে লম্বা ছুটি মঞ্জুর করে দিলেন, বেশ কিছু টাকাও দিলেন ছবির পেছনে।

সাত মাস পরে সরকারী পক্ষের লোকেরা প্রায় সম্পূর্ণ ছবি দেখলেন, শেষদিকটা তাঁদের কাছে বড় বেশি হতাশাব্যঞ্জক মনে হল, তাঁরা সুপারিশ করলেন যাতে গ্রামদেশে যেসব উন্নয়নমূলক কাজকর্ম হচ্ছে তারই খানিকটা দেখিয়ে আমি ছবি শেষ করি। আমি যুক্তি দিলাম ওরকম শেষ ত' বিভূতিভূষণের উপন্যাস নেই; দেশ স্বাধীন হবার অনেক আগে প্রকাশিত একটি উপন্যাসের অমন অযৌক্তিক রদবদলে আমি অসম্মত হলাম। শেষ পর্যন্ত আমার কথাই রইল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, 'পথের পাঁচালী'র প্রযোজক, ১৯৫৫ সালে ছবি রিলিজ করলেন।

কলকাতার একটি বড় চিত্রগৃহে ছবিটা ছ' সপ্তাহ চলল। প্রথম দিকে ভাল বিক্রি হল না, কিন্তু তৃতীয় সপ্তাহের পর থেকে বিক্রি অভাবনীয়ভাবে বেড়ে গেল, দর্শক টিকিটের জন্যে লাইন দিতে লাগল। হাউসের ম্যানেজার ছবিটা হয়ত আরো কিছুদিন চালাতেন, কিন্তু মাদ্রাজের যে ছবির জন্যে আগেই তিনি চুক্তিবদ্ধ আছেন তার প্রযোজক এস এস ভাসান তাঁর ছবির রিলিজ পিছিয়ে দিতে চাইলেন না। পরের দিন সকাল ছ'টায় আমার সঙ্গে দেখা করলেন শ্রীভাসান, 'পথের পাঁচালী' সম্পর্কে তিনি অজস্র প্রশংসা করলেন, তিনি তখন এত অভিভূত যে তাঁর চোখে জল এসে গেল। বললেন, আগেভাগে এ ছবি সম্পর্কে জানলে তিনি তাঁর নিজের ছবির রিলিজ পিছিয়ে দিতেন। আর একটি হাউসে একটানা সাত সপ্তাহ চলল 'পথের পাঁচালী', সারা বাংলায় ছবি সফল হল, ক্রমে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে; পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিনিয়োগের বহুগুণ বিনিময় পেলেন। আমি উপলব্ধি করলাম, ছবির কাজে আমি পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করতে পারি। আমি চাকরি ছাড়লাম।

ইউরোপ আমেরিকার চলচ্চিত্র ও বাংলাদেশের সাহিত্য আমার ছবির উৎসভূমি। ফ্লেহার্টি ও ডনস্কয়ির মত চলচ্চিত্র চিন্তাবিদদের কাছে আমার এ চিত্রকর্ম ঋণী, স্টাইল কিন্তু আশ্রয়ী উপন্যাসের স্টাইল। আমার মতে ছবির স্টাইল তার বিষয়বস্তু অনুসারী। তাই বলে আমাকে থিওরেটিশিয়ান মনে করবেন না যেন। একথা বিশ্বাস করবেন না যে, ছবি পরিচালনার আগে প্রতিটি সট আমি এঁকে নিই। আমি আর্টিস্ট, কোন জিনিসের মানসিক রেখাচিত্র আঁকার তাৎক্ষণিক প্রবণতা আমার আছে। 'পথের পাঁচালী' যদি ব্যবসায়িক অসাফল্যও আনত, তবু এটা প্রমাণিত হয়েছিল দর্শক আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। আমি 'অপরাজিত' করতে পারি।

আমি গু-গা-বা-বা ছবি করার জন্যে তৈরি হচ্ছি। আমার এগারো বছরের ছেলেকে খুশি করার জন্যেই এই ছবি। সে ভাবে, তার বাবার ছবি বড় বেশি বিষণ্ণ, তাই বায়না ধরেছে আমি যেন আমার ঠাকুর্দার কোন রূপকথা জাতীয় ছোটদের গল্প নিয়ে ছবি করি। এটা সঙ্গীতবহুল ফ্যান্টাসি হবে, এতে থাকবে ঠাকুরদেবতা, ভূত প্রেত, নায়ক আর কৌতুক অভিনেতা, তারা দুই জাতের মধ্যে যুদ্ধ ঠেকাতে চাইবে।

১৯৩০-৬৫-এর মধ্যে তৈরি বাংলা ছবি আমি খুব বেশী পছন্দ করি না। সেগুলোতে পশ্চিমের নকল বড় প্রকট —ক্যামেরার কাজে, নাটকীয় বিন্যাসে, সাজসজ্জায়, পোশাকে-আশাকে। 'পথের পাঁচালী' করার সময় পর্যন্ত কুমার প্রমথেশ বড়ুয়ার কোন ছবি আমি দেখি নি। এখন অবশ্য অনেকগুলোই দেখেছি, ইউরোপের নকল-করা নিকৃষ্ট ফটোগ্রাফিক স্টাইলের জন্যে তার কোনটাই আমার ভাল লাগে নি। অভিনেতা হিসেবে বড্ড বেশি নিজেকে জাহির করা, আত্মপ্রীতিবিলাসী মাত্রাতিরিক্ত মেক-আপ অনুরাগী প্রমথেশ বড়ুয়াকে আমার আরো খারাপ লাগে। ওঁর শ্রেষ্ঠ ছবি 'দেবদাস'-এর অবশ্য প্রকৃত পক্ষে বাঙালী ছবি হবার সম্ভাবনা ছিলো, নিজে অভিনয় করে ও অহেতুক ভাবাবেগ আমদানি করে তিনি তা নষ্ট করেছেন।

শ্রীবড়ুয়ার চেয়ে আমি দেবকী বসুকে বেশী পছন্দ করি। তিনি গভীর ভাবে বাঙালী, তাঁর আবেগ অকপট। ওঁর 'কবি' আপনি দেখেছেন, অপু কাহিনীর সঙ্গে তার রেলগাড়ি চলা বিষয়ে একটা সম্পর্ক লক্ষ্য করেছেন। আমার সঙ্গে দেবকী বসুর যদি কোথাও কোন মিল থাকে তা এসেছে এদেশের সাহিত্য থেকে, সিনেমা থেকে নয়। এই পরিচালক ও তাঁর শিল্পকর্মের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, যেটা কখনো কখনো ভক্তির কোঠায় পড়ে। 'অনেকদিন যাবৎ 'পথের পাঁচালী' নিয়ে ছবি করার কথা আমি ভেবেছি, যদি করতাম সেটা আপনার ছবির মতো এত ভালো হতো না।' দেবকী বসুর এই কথায় আমি উৎসাহিত বোধ করেছি।

তাঁরই সমসাময়িক নীতিন বসুর প্রতিও আমার গভীর শ্রদ্ধা। তিনি ক্যামেরাম্যান হিসাবে জীবন শুরু করেন, শেষ পর্যন্ত মূলতঃ টেকনিসিয়ান। অর্দ্ধ সামাজিক, রোমান্টিক, বা সঙ্গীতবহুল যেমন বিষয়ই হোক না কেন, হয়তো খুব বেশী গভীর নয়, তবু তাই নিয়ে তিনি সুন্দর ছবি করেছেন, ব্যক্তিত্বের ছাপ রেখেছেন। তিনিও বড়ুয়ার চেয়ে অনেক বেশী বাঙালী। ভারতীয় চলচ্চিত্রে 'প্লে ব্যাক' পদ্ধতি প্রবর্তনের কৃতিত্ব তাঁরই। তিনি 'পথের পাঁচালী' দেখে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে মোট এগারো বার ছবিটি দেখেছেন। সুবিনয়ী, সহৃদয় এই মানুষটি বর্তমানে বোম্বের চিত্রজগতের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

এইসব পূর্বসূরীদের গুরুত্বের কথা স্বীকার করেও বলবো আমি এঁদের দ্বারা আমি প্রভাবিত হই নি।

আমি নিজে নিজেই 'সিনারিও' লিখেছি, উপন্যাস বা ছোটগল্প অবলম্বনে ছবি করেছি, আমি 'থিওরী' পাগল ছিলাম, হাতে-কলমে কাজ করে অনেক কিছু শিখেছি। ছবির বিষয়বস্তু আমার নিজস্ব স্টাইল গড়ে দিয়েছে, নিস্তরঙ্গ প্রকৃতি, এদেশের মানুষের মন্থর জীবনযাত্রা, তাদের কথা বলার ও হাত নাড়ার ভঙ্গি, আমার স্টাইলের মূলে এ সবই আছে। মার্কিন চলচ্চিত্রের দ্রুততা আমার চিত্রে অনুপস্থিত, হলিউডি কায়দায় আমি ক্যামেরা ঘোরাই না।

স্টুডিওর বাইরে স্বাভাবিক আলো সহজ-সজীব পরিবেশ, জীবনের সঙ্গে ছবিকে যুক্ত করে। স্টুডিওর ফ্লোরে এ জিনিস পাওয়া যায় না। জীবন্ত মানুষ বা প্রাণবন্ত ল্যাণ্ডস্কেপ এককে সময় পরিচালককে এমন ব্যঞ্জনা যোগায় যা আইজেনস্টাইনের থিওরী কেও অগ্রাহ্য করতে পারে।

পাশ্চাত্য সঙ্গীতের কাছে আমার অজস্র ঋণ। প্রথম বার যখন ইউরোপে যাই, আমি মোজার্ট ফেসটিভ্যালে যোগদান করবো স্থির করি। সিনেমার মতো সঙ্গীত ও শিল্পগতভাবে সময়ের পরিধিতে বাঁধা, ছবি সময়ের অনুশাসন মেনে একটু একটু করে নিজেকে উন্মোচিত করে। ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত অবশ্যই সুন্দর, কিন্তু সময়ের কাছে দায়বদ্ধ নয়।

আমি যখন স্কুলে পড়ি আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে পেয়ে পেলাম বিটোফেনের একটা রেকর্ড। এই মহান শিল্পীর সঙ্গীত শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বিটোফেন সম্পর্কে যেখানে যত লেখা পেলাম সব পড়ে ফেললাম। কলেজে ঢোকার আগে থেকেই আমি পাশ্চাত্য-মার্গ সঙ্গীতের রেকর্ড সংগ্রহ করতে শুরু করলাম। আমার ছবিতে 'সিম্ফনি' বা 'সোনাটা'র যথেষ্ট প্রভাব আছে। 'চারুলতা'র জন্যে অবিরাম ভেবেছি মোজার্টের কথা।

আমি নতুন নতুন মনস্তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে ছবি করার কথা ভেবেছি, তার ভাষা এমন হবে না, যা দর্শক বুঝবে না।

অনেক নতুন পরিচালক ইচ্ছে করে দর্শকের কথা ভুলে যান, তাই বেশিদিন পরিচালনার জগতে থাকতেও পারেন না। আমি দর্শকের সঙ্গে সব সময় কাছাকাছি থেকেছি। আমার সব ছবিই কলকাতায় প্রথম দফায় অন্ততঃ ছ' সপ্তাহ চলেছে। প্রযোজকেরা নিশ্চিন্ত, আমি যে-সব পরিচালকদের বাজারে আছে তাদের একজন, ফলে মনোমত প্রযোজক বেছে নিতে পারি।

আমি অপব্যয় না করে যথাসাধ্য অল্প খরচে ছবি করি, প্রতি ছবির গড় খরচ তিন লক্ষ টাকা, এমন কি আমার রঙীন ছবিও ঐ বাজেটের মধ্যে রাখার জন্যে চার সপ্তাহে শেষ করেছি। অল্প খরচের ছবি, বাংলার বাজার থেকে সেটা উঠে যায়, গোটা ভারতবর্ষের কথা ভাবতে হয় না, বিদেশের কথা তো নয়ই। আপনি বলেছেন যে আমার 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' টোকিওতে, লণ্ডনে, প্যারিসে, ভালো ব্যবসা করতে পারে, ভালো কথা, কিন্তু দেশের বাজারের কথাই আমি আগে ভাববো।

সত্যজিৎ রায়ের জগতে

মিকেল সেগেঁৎ

পথের পাঁচালী (১৯৫২-৫৫), অপরাজিত (১৯৫৭), পরশ-পাথর (১৯৫৭), জলসাঘর (১৯৫৮), অপুর সংসার (১৯৫৯), দেবী (১৯৬০), তিন কন্যা (১৯৬০), রবীন্দ্রনাথ (তথ্যচিত্র, ১৯৬০), কাঞ্চনজঙ্ঘা (১৯৬১)—এই নয়টি ছবি নিয়ে সত্যজিৎ রায়ের জগৎ এবং এদের অধিকাংশ ফরাসী দেশে অপরিচিত।

অপু-ত্রয়ীর তৃতীয় ভাগ এখানে বিলম্বে মুক্তিলাভ করায় রচয়িতার উপলব্ধিগুলিকে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে অনুসরণ করার সুযোগ পেয়েছি। এতাবৎ আমাদের ধারণা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

ফরাসী দেশে এই ছবিটিই প্রথম প্রদর্শিত হয়েছে। 'অপরাজিত'র আকস্মিক গোল্ডেন লায়ন পুরস্কার লাভ দর্শকসাধারণের মনে একটি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। লোকের ধারণা শ্রীরায় সেই জাতের চলচ্চিত্র-কারিগর যাঁর ছবি যদি কখনো বাধ্য হয়ে ফরাসী দেশে দেখাতে হয় তাহলেও অন্ততঃ অব্যবসায়িক ভিত্তিতে দেখানো উচিত। 'পথের পাঁচালী' এবং 'অপুর সংসার'-এ অবশ্য অসংখ্য সৌন্দর্য আছে, যার অংশ মাত্র 'অপরাজিত'তে পাওয়া যায়। এই দুটি ছবির দৌলতে শ্রীরায় একজন গণ্যমান্য স্রষ্টা হিসাবে পরিগণিত হতে পারেন।

এই চিত্রত্রয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য উনিশ শতকীয় ইউরোপের বিরাট উপন্যাসগুলির। ডি থিলহেলম মাইস্টু-র লেখা 'লস্ট ইলিউশন্‌স' পুস্তকে আমরা একটা আখ্যান দেখতে পাই যাতে শিক্ষানবীশী এবং ভবঘুরে জীবন-অন্তে জীবনের বিচিত্র পরীক্ষার ভেতর দিয়ে নায়ককে আমরা গড়ে উঠতে দেখি। রলাঁ এবং গোর্কির মধ্যেও আমরা সমজাতীয় সাহিত্যিক প্রত্যয়ের বংশধরদের সাক্ষাৎ লাভ করি। কিন্তু শ্রীরায়ের ছবিগুলির সঙ্গে এইসব লেখকদের সাদৃশ্য বাহ্যিক মাত্র।

এখানে গ্রাম থেকে শহরের দিকে যাত্রা সামাজিক জয়ের অথবা নৈতিক মুক্তির বাসনার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ হচ্ছে পৌরাণিক ভারতের সঙ্গে আধুনিক ভারতের মুখোমুখি পরিচয় (যে পরিচয় রায়ের তোলা রবীন্দ্রনাথের লেখা 'তিন কন্যা'র গল্পগুলিতে আমরা দেখতে পাই)।

সংগত কারণে শ্রীরায় ডনস্কয় এবং ফ্লেহার্টির মত রচয়িতার সঙ্গে তুলনীয়। 'নানুক', 'স্যালুৎ দে এঁ ফা গু স' (ডনস্কয়ের দ্বিতীয় কাজ) ল্যোম দ্যারান, মাভি ত্থেনর্ফাৎ ল্যার্ এঁ সীয়েল, লুইসিয়ানা স্টোরি ইত্যাদির মধ্যে আমরা দেখতে পাই কাব্য এবং পরম সম্পর্কে সহজাত বোধের কারণে শিশুরাই পরিণামে জীবনের উৎসে উপনীত হতে সমর্থ। শিশুদের কি করে সৃষ্টি করতে হয় তা সত্যজিৎ রায় ভালই জানেন।

ফ্লেহার্টি এবং ডনস্কয়ের মতো শ্রীরায়ের রচনাতেও জল একটি অপরিহার্য বিষয়। আপন স্রোতধারায় প্রবাহিত নদী মানবসত্তার প্রকাশ। নদীর যে প্রবাহ অনুপলব্ধ হয়েও সত্যতায় উত্তীর্ণ হয়ে ওঠে তা কাল প্রবাহের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিক দুটির পরিচায়ক। নদীর সম্পর্কে চিন্তা ধ্যানের প্রবণতা আনয়ন করে, আবার এর প্রবাহ মানুষের ভ্রমণ এবং অভিযান স্পৃহাকে উত্তেজিত করে। ভারত মানসকে প্রগাঢ়ভাবে অনুধাবন করার পথে নদীর প্রতীকী অর্থের গুরুত্ব রেনার সম্পূর্ণ অনুভব করেছিলেন এবং সকলেই জানেন যে, তিনি শ্রীরায়ের দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত। কিন্তু এই তীর্থসলিলই কখনো কখনো মৃত্যুর মতো ভয়াল। সেইজন্য বর্ষা যেমন আবশ্যক তেমনি অনিষ্টকর। যে গঙ্গা বারাণসীর পুণ্য তীরে বিধৌতকরে সেই আবার তার বন্যায় শস্যহানি ঘটায়। 'পথের পাঁচালী'তে দুর্গা বৃষ্টিধারার

মধ্যে নৃত্য করে আবার প্রকৃতির সঙ্গে এই সংযোগ থেকেই তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। 'অপুর সংসারে' নায়ক হাস্য-মুখে বৃষ্টিধারায় নিজেকে অভিষিক্ত করে। 'পথের পাঁচালী'র সেই চমৎকার দৃশ্যটিতে যখন অপুর ছুঁড়ে দেওয়া মালাটিকে দু'পাশের পানা এসে গ্রাস করে নেয় তখন আমরা বুঝতে পারি এই প্রকৃতির মধ্যে একদিকে যেমন অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য, অন্যদিকে তেমনি আগ্রাসী ক্ষমতার প্রকাশ।

তাঁর পরবর্তী কর্মে নতুন চিন্তার সাক্ষ্য মেলে। 'দেবী'তে একটি তরুণীর কালীর অবতাররূপে আত্মপ্রকাশ এবং সেই বিশ্বাসেই তার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে কুসংস্কারের নিন্দা করা হয়েছে। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'য় এক ছুটির বিকেলে একটি ধনাঢ্য বাঙালী পরিবারের মধ্যে বাংলা দেশের নতুন সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের আলেখ্য পাওয়া যায়। ছবিটির প্রতি-বিম্বন যদিও সংক্ষিপ্ত তবু ই এম ফরস্টার-এর প্রশংসনীয় উপন্যাস 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া'র সঙ্গে এর বিরল আত্মীয়তা। কিন্তু ফরস্টারের উপন্যাসের উপনিবেশ সম্পর্কিত বিশ্লেষণ এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বর্ণনা ১৯২৫ সালের পূর্বেকার।

বিপরীত দৃষ্টান্ত হিসাবে গোর্কির 'আমার ছাত্রজীবন' এবং তৎপরবর্তী 'আমার কর্মজীবন'-এর উল্লেখ করা চলে। কিন্তু রায়কে আত্মসমর্পণের প্রবক্তা মনে করলে ভুল হবে।

বিবাহ করার আকস্মিক সংকল্পের মধ্যে অদৃষ্টের কাছে আত্মসমর্পণের চেয়ে জীবনকে নিয়ে বাজি ধরার প্রবৃত্তিটাই প্রবল। একটি অসাধারণ বলিষ্ঠ দৃশ্যে বিদ্যুৎ উদ্ভাসের মতো আলোকিত হয়েছে অর্পণার মুখের ওপর নিবদ্ধ-দৃষ্টি অপু এবং অপর্ণার রূপে তার দৃশ্যমান সম্মোহ। বিবাহের পরে শ্রীরায় তাঁর ক্যামেরায় যে একান্ত দৃশ্যগুলিকে আমাদের গোচর করেন তা অচিরে প্রেমের কোমল গাথা হয়ে বিকশিত হয়। কিন্তু এই কুসংস্কারের বাতাবরণে গাথা সর্বদাই উপস্থিত, ভাবী বর বিকৃতমস্তিষ্ক, অতএব বিকল্প একজন বর চাই নতুবা ভাবী নববধূর শাপমুক্তি সম্ভব নয়। রায়ের ছবিতে গাথা এক নতুন বিষয় যা তিনি এমন সোজাসুজি বর্ণনা করেন যেন তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি সচেতন। তাই অর্পণার অভাবিত মৃত্যুর বর্ণনাও সমানভাবে সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। দম্পতির প্রথম মিলনের ভীরুতা এবং খাপছাড়া ভাব মুহূর্তে এমন আবেশে রূপান্তরিত হয় যা একমাত্র স্বল্পতম বর্ণনার মধ্যেই প্রকটিত হতে পারে। নিম্নলিখিত সংলাপ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত এক আশার পরিবেশে এই দম্পতির মানসিক সমন্বয়কে প্রতি-ফলিত করেছে:

তুমি কি দারিদ্র্যকে ভয় পাও?

হ্যাঁ।

গরীব স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে পারবে তো?

হ্যাঁ।

সন্তানের জন্মকালে অপর্ণার মৃত্যুর সংবাদবহনকারীর চেহারা গ্রীক ট্র্যাজে-ডির চরিত্রের মত। অপুর কাছে লেখা শেষ পত্রে অর্পণার কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত। একটা প্রেমের জীবনকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে এই হঠাৎ বিচ্ছেদ নিয়তিকে তাৎপর্যময় করে তুলল। শ্রীরায়ের সৃষ্টি বাহু জীবনেচ্ছা এবং নিয়তিভাবনার মাঝখানে দোদুল্যমান।

রায়ের শিল্প প্রকৃতপক্ষে এক কাব্যিক সত্যের অন্বেষণ। তির্যক সংলাপের অথবা পল্লবিত কাহিনী নির্মাণের মধ্যে দিয়ে প্রেম নিজেকে প্রকাশ করে না; বরং নারীর গুণ্ঠনসজ্জিত মস্তকের ঈষৎ সঞ্চালনে কিংবা তার ইতস্তত কটাক্ষে অথবা তার ভঙ্গিল কলহাস্যের মধ্যে দিয়ে রায়ের জগতে প্রেম আভাসিত হয়। অথচ এই বলিষ্ঠ প্রতীকী কাহিনীর মধ্যে নিও-রিয়ালিজমের কিছু ব্যাপার নেই। সারা দিনের সমগ্র কর্মকাণ্ডকে রায় ত্রিশটি সংক্ষিপ্ত দৃশ্যে সংহত করতে পারেন, আর জানেন নিপুণ ক্যামেরা সঞ্চালনে কি করে বিরাট এক প্রত্যাশাকে জাগিয়ে তুলতে হয়। একজন সাধারণ মানুষের জীবনের নব্বই মিনিটের ঘটনা চিত্রায়িত করার স্বপ্নও রায় দেখেন বলে আমার বোধ হয় না। তাঁর রয়েছে নিসর্গ দৃশ্য, পতঙ্গতাড়িত জলতল, পাতার মর্মর, বাতাসের স্পর্শে টেলিগ্রাফের তারের সোঁ সোঁ শব্দ ইত্যাদি। সতর্কভাবে লক্ষ্য করলে এরা 'দি এক্লিপ্স'-এর টেবু-লার অনুরণনের সগোত্র। ভারতের আর্দ্র জলবায়ু, বায়ুচালিত অভ্রলগ্ন মেঘরাশি সুব্রত মিত্রের ক্যামেরায় চমৎকার ধরা দিয়েছে। রবিশঙ্করের সঙ্গীতের, (যার সম্বন্ধে দু' একটা উল্লেখই যথেষ্ট হবে, যথা দুর্গার মৃত্যুদৃশ্যের এবং আরো দু' একটি সিকোয়েন্সের ধ্বনি-প্রতিমা দর্শকের কাছে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে) বিশেষ প্রেরণা আমাদের সচেতন করে তোলে যে, কি উদ্দেশ্যে এবং কি শৈলীতে এর মধ্যে পুরাতন সিনেমাটোগ্রাফিক ঐতিহ্য এবং অতি আধুনিক নিরীক্ষার সমন্বয় ঘটেছে (ফ্লেহার্টি, রেনোয়া, ডনস্কয়, ফোর্ড ইত্যাদি)।

সত্যজিৎ রায়ের মাধ্যমে আমরা এমন একজন পরিচালকের পরিচয় লাভ করি যিনি (যদিও এতাবৎ যাঁদের সঙ্গে আমরা তাঁর তুলনা করেছি, তাঁদের চেয়ে তিনি কিয়ৎন্যূন) তাঁর ব্যক্তিত্বের বলে সর্বদ আমাদের আগ্রহকে জাগরূক রাখবেন। পৃথিবীকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে জানতে সাহায্য না-করার জন্য আমরা সহজেই রায়কে অনুযোগ করতে পারি।

আমি কীভাবে ছবি তৈরী করি

আমি বুদ্ধিজীবী পরিচালক নই। যা আমি ঠিক মনে করি, তাই করি। পরিচালনা, অভিনয়, সঙ্গীত—আমার ছবির প্রতিটি ক্ষেত্রেই এটা মেনে চলি।

লণ্ডনের ন্যাশনাল ফিল্ম থিয়েটারে লিণ্ডসে এ্যাণ্ডারসনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে শ্রীসত্যজিৎ রায় উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন।

সাক্ষাৎকারের বিশদ বিবরণ নিচে দেওয়া হল।

প্র: আপনাকে কি বাঙালী চিত্র-পরিচালক বলা ঠিক হবে? ভারতীয়, না বাঙালী—কি বলা উচিত?

উ: আমি নিজেকে বাঙালী পরিচালক বলে মনে করি।

প্র: আপনি কি ভারতীয় ও বাংলাদেশের ছবির ঐতিহ্য সম্পর্কে আমাদের কিছু বলবেন? ঐতিহ্য বলে আদপে কি কিছু ছিল?

উ: প্রথম কাহিনীমূলক ছবি ১৯১৩ সালে বোম্বেতে তৈরি হয়। তারপর কলকাতাতে ছবি আরম্ভ হতে বিশেষ দেরী হয় নি। নির্বাক ছবিগুলি 'মিউজিয়াম পিস' হিসাবেই রয়ে গেছে। সেগুলো দেখবার কোন সুযোগ আমরা পাই নি। আগুনে অর্ধেক ছবি পুড়ে গেছে। বাংলাদেশ ঐতিহ্য-প্রধান; এবং সাহিত্যে বিশেষভাবে পুষ্ট। রবীন্দ্রনাথ কিছু গল্প লিখেছেন, তার মধ্যে অধিকাংশই অমর হয়ে আছে। আমি এপর্যন্ত তাঁর ছ'টি গল্প নিয়ে ছবি তৈরি করেছি।

প্র: রবীন্দ্রনাথ একসময় পশ্চিমেও খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলেন, কিন্তু তারপর আর নয়। কেন?

উ: প্রথমত, আমি মনে করি রবীন্দ্রনাথকে অনুবাদ করা অসম্ভব। ভারতবর্ষের অনেক পরিচালকই রবীন্দ্র-নাথের গল্প অবলম্বন করে ছবি করেছেন। আর তাঁর লেখা নভেলের চেয়ে ছোটগল্পকে ছবি করা সহজ। আমি নিজেও তাই করি।

প্র: 'পথের পাঁচালী'র মূল গল্প কত বড় ছিল?

উ: আসলে ওটা দুটো বই। ১৯৪০ সালে আমি প্রথম বইটা পড়ি, তারপর বইটার ছবি আঁকার কাজ আমাকে দেওয়া হয়। তখনই আমার মাথায় ছবি করার পরিকল্পনা আসে। বেশ কয়েক বছর আগে ছবি করার চিত্রনাট্য লেখার অভ্যাস ছিল আমার। প্রায়ই অবসর সময়ে বসে বসে লিখতাম। ভাবতাম, কোন চিত্রনাট্যকে হয়ত কোনদিন ছবি করব।

প্র: জাঁ রেনোয়া কিছু বলে-ছিলেন কি?

উ: রেনোয়া তখন কলকাতায় 'দি রিভার' ছবির শুটিং করতে এসেছিলেন। উনি আমার অফিসের কাছে হোটেলে উঠেছিলেন। একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম, আর নিজের পরিচয়ও দিলাম। পরবর্তীকালে ওঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। উনি গ্রামবাংলার সঙ্গে পরিচিত একজন লোক খুঁজছিলেন। আমিই ওঁর সঙ্গে গেলাম।

প্র: আপনি কি ছবি করবার সময় চাকরি ছেড়েছিলেন?

উ: না, আমি চাকরির ফাঁকে ফাঁকে 'পথের পাঁচালী' তৈরী করেছি-লাম। সত্যি কথা বলতে কি, আমার মাইনের অনেকটাই ছবির জন্যে খরচ হয়েছিল। আমি রেনোয়াকে সমস্ত ব্যাপারটা বললাম। তিনি 'চমৎকার' বলে আমায় উৎসাহ দিলেন। বিলেত থেকে ফেরবার সময় আমি প্রথম চিত্র-নাট্য লিখেছিলাম।

প্র: বোম্বের ছবি সম্পর্কে আপনার কি মত?

উ: বোম্বের ছবিগুলো এখনকার মত চিরকাল ছিল না। প্রথম দিকে ওরা বেশ কিছু বাস্তবধর্মী ছবি প্রযো-জনা করেছিল। যেমন শান্তারাম করে-ছিলেন। কিন্তু পরে ওরা বদলে গেছে।

প্র: প্রযোজকেরা আপনাকে পছন্দ করেন?

উ: বাংলাদেশ আমাকে খুব পছন্দ করেন। তাঁদের কাছে আমি খুব নিরাপদ।

প্র: আপনি কি একই ইউনিট নিয়ে কাজ করেন?

উ: হ্যাঁ। আমার শিল্প-নির্দেশক সব ছবিতেই থাকেন। ঘটনাক্রমে সেও 'দি রিভার'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। আমার দুজন ক্যামেরাম্যান আর সহ-কারী পরিচালক। তাঁরা সব ছবিতেই থাকেন।

প্র: কোথায় পেলেন তাঁদের?

উ: সুব্রত মিত্র তখন সবে কলেজ

থেকে বেরিয়েছে। ফোটোগ্রাফীর ওপর ওর ভীষণ উৎসাহ ছিল। তাছাড়াও আমার কথা খুব শুনত। আমরা দুজনেই ব্রেসোর ভক্ত ছিলাম।

প্র: আপনি কিভাবে চিত্রনাট্য লেখেন?

উ: খুব ঘনভাবে লিখি। তবে সাধারণত জায়গায় গিয়ে দেখে নিই কোন পরিবর্তন করতে হবে কিনা।

প্র: আপনি কি শুটিংএর সময়েই সম্পাদনা করতে থাকেন?

উ: হ্যাঁ, যতটা সম্ভব হয়।

প্র: আপনি কি সম্পাদককে পুরো স্বাধীনতা দেন?

উ: না। আমি নিজে সব সময় থাকি। আমার অনুপস্থিতিতে কিছু হয় না।

প্র: কিভাবে শুটিং করেন? প্রতিদিনই কি?

উ: সবসময় নয়। কিন্তু দিনের বেলায় যতটা সম্ভব কাজ করি। এমনকি দরকার হলে রবিবারেও।

প্র: আপনি একই ধরনের ছবি বার বার করতে চান?

উ: না। তাতে আমার মানসিক চিন্তাধারায় কষ্ট হয়। কখনো দুঃখজনক ছবি করার পর আমাকে বিশ্রাম নিতে হয়। আর আমি নানাধরনের অভিব্যক্তির ওপর ছবি করি।

প্র: একটা ছবি শেষ করেই কি আবার একটা আরম্ভ করে দেন?

উ: তিনচার মাস বিশ্রাম নিয়ে নিই। কিন্তু আমাকে তাড়াতাড়ি ছবি করতে হয়, কারণ আমার সহযোগীরা কোন বাঁধা মাইনে পান না।

প্র: ওঁরা কি অন্য ছবির পরিচালকদের সহযোগিতা করেন?

উ: যতদূর সম্ভব না করার চেষ্টা করেন। তবে আমার ক্যামেরাম্যান আর সম্পাদক করে থাকেন।

প্র: আপনাদের দেশে পরিবেশন ব্যবস্থা কি রকম? আপনি কি তার কোন টাকা-পয়সা লাভ করতে পারেন?

উ: আমাদের সব সময়ই খরচার দিকে তাকাতে হয়। আঞ্চলিক বাজার খুবই সংকীর্ণ। বাংলাদেশে (পূর্ব পাকিস্তানে) ভারতীয় ছবির প্রবেশ নিষেধ। তারা চায় নিজেদের শিল্পের উন্নতি।

প্র: আপনার ছবি কি দেশের অন্যান্য জায়গায় সাবটাইটেল করে দেখানো হয়?

উ: না। আমাদের দেশে সাবটাইটেলের বিশেষ সুযোগ নেই। সবচেয়ে কাছে যে দেশ তার নাম বেরুট বা কায়রো।

প্র: বিদেশে পরিবেশন ব্যবস্থা কি রকম?

উ: মুনিখে এরকম একজন লোক আছেন, যিনি আমার সমস্ত ছবি কেনেন। কিন্তু তিনি সেগুলি পরিবেশন করেন না। তাঁকে একজন সংগ্রহকারক বলা যায়। বার্লিনে শুনেছিলাম আমার ছবি সমস্ত দেশ জুড়ে চলছে, কিন্তু কোন খবর পাই নি।

প্র: আপনি এজন্যে কোন উত্তেজনা বোধ করেন না?

উ: মুহূর্তের জন্যে।

প্র: আপনার সঙ্গীত পরিচালনা সম্পর্কে কিছু বলুন।

উ: তিনকন্যার পর থেকে আমি নিজেই আমার ছবির সঙ্গীত করি। তার আগে রবিশঙ্কর, বিলায়েত খাঁ এবং আলি আকবর খাঁকে দিয়ে করিয়েছি। ছবির জগতে আসবার আগেই আমার সঙ্গীতের ওপর ঝোঁক ছিল। তা থেকেই একটা বোধ গড়ে উঠেছিল।

প্র: আপনি কি কোন গান লিখেছেন?

উ: হ্যাঁ। 'দেবী'র জন্যে গান লিখেছিলাম। কিন্তু তার কথা প্রচলিত ছিল, শুধু সুর আমার।

প্র: আপনার কোন ডাবিং করার অভিনেতা আছে?

উ: না।

প্র: আপনার ছবির গতি সম্পর্কে কিছু বলবার আছে?

উ: আমি বুঝতে পারি কেন লোকে আমার ছবিকে ধীরগতি বলে। কিন্তু নানা মুনির নানা মত। কোন ছবিতে একজন বাঙালী বিধবার কথা ধরা যাক। যিনি শাদা পোশাক পরে থাকেন। অপুর মা তাঁর স্বামী মারা যাবার পর সাদা পোশাক পরে থাকেন। এই ব্যাপারটা ভারতীয় দর্শকদের মনে গভীর রেখাপাত করলেও, পাশ্চাত্যে এটার কোন মূল্য না থাকতে পারে।

প্র: আপনি গল্পের মধ্যে কি খোঁজেন?

উ: বলা শক্ত। একটা গল্পের মধ্যে অনেক কিছু থাকে। নানান চরিত্র, নানান ঘটনা, পরিবেশ ইত্যাদি। ডস্টয়ভস্কির উপন্যাস ছবি করা অসম্ভব। যতক্ষণ না সংক্ষিপ্ত কোন সংস্করণ আমাদের হাতে থাকে।

প্র: আপনার নিজের লেখা চিত্রনাট্য সম্পর্কে কি মত?

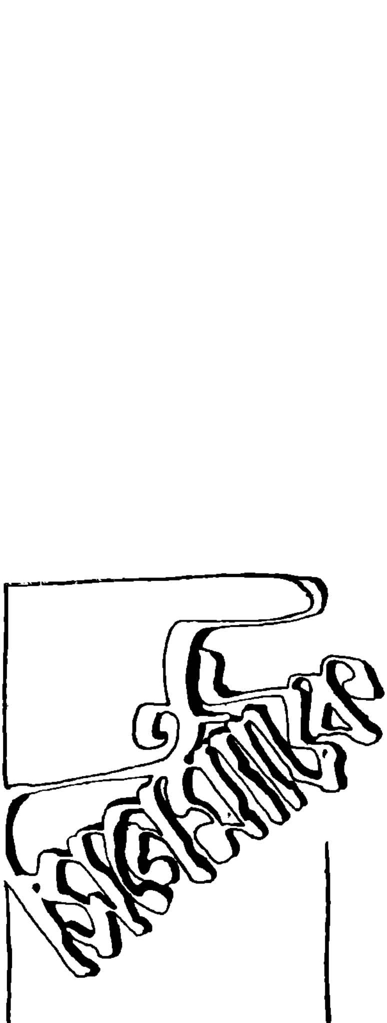
উ: আমি যাদের চিনি, আমার দেখা পৃথিবীকে নিয়ে লিখি। উনবিংশ শতাব্দী সম্পর্কে তো কিছু জানাতে চাই না।

প্র: আপনি সামাজিক সমস্যা নিয়ে ছবি করেন, কিন্তু শেষে কোন উত্তর দেন না কেন?

উ: হ্যাঁ। আমি ছবির শেষে কোন সমাধান নিই না। আমি চাই দর্শকরা সমস্যা নিয়ে চিন্তা করুন। আমি শুধু তাই চাই। কারণ কোন ছবি কি সামাজিক ব্যবস্থা বদলাতে পারে? 'ইফ' ছবিই কী পারবে পাবলিক স্কুল-এর চিন্তাধারাকে বদলাতে? আমি মনে করি তা হতে পারে না।

প্র: আপনি আধুনিক সমস্যা নিয়ে ছবি করেন না কেন?

উ: প্রায় অর্ধেক ছবিই বর্তমান সমস্যা নিয়ে তৈরী। এখন আমি আধুনিক এক লেখকের গল্প নিয়ে ছবি করছি।



এইচ.রে

ফ্লাহার্টি ফাউনডেসন সেমিনারে আমাদের অত্যন্ত সম্মানীয় অতিথির আগমন আমার চিরকাল মনে থাকবে। বাংলা দেশ থেকে ব্র্যাটলবরো, ভেরমন্ট অনেক দূরের পথ। শ্রীরায়ের দীর্ঘ দেহ, প্রশস্ত চেহারা, দয়ায় ভরা আশ্চর্য উজ্জ্বল চোখ এক নজরেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো আমার। আরো অবাক হলাম, ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গের ভারি ব্যাগটা নিজেই তুলে নিলেন হাসি মুখে। কাউকে বইতে দিলেন না। ভদ্রলোকের বগলে অসমাপ্ত একটা স্ক্রিপ্ট গোঁজা আছে।

পরে শুনেছিলাম ওগুলো ঠিক স্ক্রিপ্ট বলতে যা বোঝায় তা নয়, ওতে চমৎকার করে চিত্রনাট্যের স্কেচ আঁকা আছে মূল বাংলা বইটি শুদ্ধ। রায় চিত্র পরিচালক হওয়ার আগে বইপত্রের মলাটও আঁকতেন। রায় বলেছিলেন :

আমার ঠাকুর্দা ছিলেন একাধারে একজন আঁকিয়ে, কবি ও বিজ্ঞানী। তিনি বাংলা ভাষায় প্রথম শিশুদের পত্রিকা সম্পাদনা করেন, ভারতবর্ষে প্রথম হাফটোন ব্লকের প্রচার ও প্রবর্তন করেন। আমার বাবাও ছিলেন বেশ নামকরা লোক। নানা ধরনের লেখা ছাড়াও তিনি আবোল-তাবোল ছড়া লিখে খুব নাম করেছিলেন। বলা যেতে পারে তিনি ভারতবর্ষের এডওয়ার্ড লিয়ার। আমারও দারুন ঝোঁকছিলো ফিজিক্স ও ইকনমিক্স-এ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি ওই বিষয় দুটিতে অনার্স সহ পাস করি।

এরপর আমি যাই শান্তিনিকেতনে। ঠাকুরবংশের আমাদের সঙ্গে পারিবারিক বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিলো বেশ কয়েক বছর ধরে, ফলে আমি স্বাভাবিকভাবেই শান্তিনিকেতন যাই। যাই হোক, শান্তিনিকেতনেই আমি প্রথম শিল্পচর্চার দিকে আকৃষ্ট হই ও ছবি আঁকা শুরু করি।

সেখানে একজনের কাছে আমি ভীষণভাবে ঋণী। ভদ্রলোকের নাম নন্দলাল বসু, তিনি আমাকে ছবি আঁকা শেখান। তিনিই আমাকে প্রথম সৃজনশীল হতে সাহায্য করেন।

আপনি কী ওখান থেকে ডিগ্রি নিয়েছিলেন ?

না। আমি পাঠক্রম অবধি শেষ করি নি। ওখানে ফিল্মেরও কোনো ব্যাপার ছিলো না, কিন্তু কেন জানি না ফিল্ম আমাকে আকৃষ্ট করে তখন থেকেই। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে, শিল্পের ইতিহাস ও চৈনিক কালিগ্রাফিক সম্পর্কে প্রচুর পড়াশোনা করে আমি কলকাতায় চলে আসি।

ফাইন আর্টে আমার কোনো ভবিষ্যৎ নেই দেখতে পেয়ে আমি একটা বিজ্ঞাপনী সংস্থায় যোগ দিই ১৯৪৩ সালে। দীর্ঘদিন এদের সঙ্গে আমি নানা বিভাগে কাজ করি। এখানে আমি সুযোগ পেলেই বিজ্ঞাপনের মধ্যে আধুনিক পশ্চিমী ঢং ও পুরাতনী বাঙালী শিল্পের ঢং মিলিয়ে মিশিয়ে দিতাম। এতে করে বিজ্ঞাপনগুলো একটু নতুন ধরনের হয়ে উঠলো।

রায় যখন আমাকে আস্তে আস্তে তাঁর জীবন শুরুর গল্প বলতে লাগলেন আমি তার মধ্যে, প্রায় প্রতিটি ঘটনার মধ্যেই একটি অনিবার্যতার আভাস পেলাম। রায়ের জীবনের চূড়ান্ত মুহূর্ত এলো তখনি, যখন তিনি 'পথের পাঁচালী' চিত্রিত করার অনুরোধ পেলেন।

খুব জনপ্রিয় এই বইটির মধ্যে রায় যেন নিজের মনকে খুঁজে পেলেন, একটির পর একটি স্ক্রিপ্ট করে গেলেন তিনি যতক্ষণ না তাঁর মনের মধ্যে এই বইটিকে চিত্রায়িত করার বাসনা জাগলো।

তিনি জানতেন এই 'পথের পাঁচালী'কে ছবি করতে গেলে তাকে মামুলি ছবির মতো করা চলবে না। এর মধ্যে গ্রামবাংলাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। কিন্তু ছবি করার কথা 'ভাবা' এক আর ছবি করা আর এক। নানা ধরনের অসুবিধের মধ্যে পড়তে হলো তাঁকে।

১৯৫০ সালে, রায় বললেন, গেলাম ইংল্যাণ্ডে। আমার ফার্ম আমাকে পাঠিয়েছিলো। ওখানে ছিলাম তিন মাস। এই তিন মাসে আমি নব্বই-টারও বেশি ছবি দেখেছি। এই ছবি-গুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি।

'বাইসিকল থিফ' ছবি দেখার পর আমি যেন বুঝতে পারি কোন ধরনের ছবি আমি করতে পারবো। কোনো তারকা নয়, শুধুমাত্র লোকেশনের ছবি।

এরপর দেশে ফিরে একজন ফিনান-সিয়ার ধরার জন্যে আমি উঠে-পড়ে লাগলাম। পুরো ১৯৫১ সাল কেটে গেলো, ছবি প্রযোজনার জন্যে কাউকে পেলাম না।

কাউকে বোঝাতে পারলাম না আমি কোন ধরনের ছবি করতে চাই। আমি যা করতে চাই তা এর আগে কেউ করে নি। আমাদের দেশে ছবি হোতো চিরাচরিত প্রথায়, হলিউডের অনুকরণে ও থিয়েটারের কায়দায়। নইলে পুরোপুরি ভক্তিমূলক।

এই সময়ে একমাত্র লোক যিনি আমাকে ছবি করার উৎসাহ দিয়ে-ছিলেন, তিনি হলেন জাঁ রেনোয়া। আমার এক বন্ধু রেনোয়ার সঙ্গে কাজ করেছিলেন 'দি রিভার' ছবিতে। বন্ধুটি রেনোয়াকে বলেছিলেন আমার পরিকল্পনার কথা। রেনোয়ার সঙ্গে যখন দেখা হয়, রেনোয়া তখন আমাকে বলেছিলেন, পরিকল্পনা ছেড়ো না।

না, পরিকল্পনা আমি ছাড়ি নি। ১৯৫২ সালে নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আমি ছবির কাজে হাত দিলাম। ভেবে-ছিলাম, কাজ শুরু হলে কাউকে না কাউকে পাওয়া যাবে। শুধু এক-জন পেশাদারী আর্ট ডাইরেক্টার, বাকী আমরা ক'জন এ্যামেচার। আমরা কেউই চাকরি ছাড়ার ঝুঁকি নিতে পারি নি। রবিবার আর ছুটির দিনে আমরা কাজ করতাম।

শেষ অবধি আটকে গেলাম। আমাদের সাহায্য করতে কেউ এগিয়ে এলো না। অবশেষে দেড় বছর পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার এগিয়ে এলেন।

রায় থামলেন।

আচ্ছা, আপনি কী গল্পের পরিবর্তন করেছিলেন ?

হ্যাঁ। খুব সামান্য কিছু, অবশ্য 'অপরাজিত'-র একটু বেশি। 'পথের পাঁচালী'তে তিনশো চরিত্র আছে, আমাকে বাধ্য হয়েই ছাঁটাই করতে হয়েছে একটু। সিনেমায় গল্প শোনা-বার একটি নিজস্ব রীতি আছে, এর জন্য স্বাধীনতা চাই বই কি। আমার প্রধান কর্তব্য 'সিনেমাটিক' পদ্ধতির দিকে নজর রাখা।

আচ্ছা, 'পথের পাঁচালী'তে কী বিশেষ কোন বক্তব্য ছিলো ? বাংলা-দেশের অথবা ভারতবর্ষের ? আর এই বক্তব্যের জন্যেই কী গল্পটা ভালো লেগেছে আপনার ?

রায় মাথা নাড়লেন।

গল্পের মর‍্যাল বা মেসেজ সম্পর্কে আমি মোটেই আগ্রহী নই। তবে হ্যাঁ, এই গল্পের মধ্যে সত্যিকার ভারত-বর্ষকে খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এইটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট নয়—এর মধ্যে এমন একটা সত্য ভাষণ আছে যা আমি নায়ক, লুসিয়ানা স্টোরি, আর্থ ও সাউদার্ণারে পেয়েছি।



[দিল্লির ইংরিজি কাগজ সেঞ্চুরি-র মে ৯, ১৯৬৪ সংখ্যায় শ্রীদেবু মজুমদার ও শ্রীপি এস রাও 'মহানগর' সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ লেখেন। 'মহানগর'কে স্টেট এ্যাওয়ার্ডের তালিকায় তৃতীয় শ্রেণীভূক্ত করার জন্যে শ্রীমজুমদার ও শ্রীরাও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অতঃপর প্রবন্ধ লেখকদের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহু চিঠিপত্র ছাপা হয় ঐ সেঞ্চুরি কাগজে। পত্রলেখকদের অনেকেই সত্যজিৎকে কোনোরকম স্বীকৃতি দিতে রাজী হন নি। হঠাৎ শ্রীমতী মারি সিটনও সেঞ্চুরির সম্পাদককে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিটির বাংলা তর্জমা এখানে দেওয়া হোলো]

মারি সিটন

সত্যজিৎকে ছোট করে দেখো!

বোম্বে ও কলকাতায়, আপনাদের কাগজে প্রকাশিত 'মহানগর' নিয়ে যে তর্কাতর্কি শুরু হয়েছে তা আমি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পড়ে যাচ্ছি। গত তিন-চার বছর ধরে লক্ষ্য করছি সত্যজিৎ যে ছবিই করুন না কেন তাই নিয়ে নানা ধরনের বাগবিতণ্ডার সৃষ্টি এমনভাবে করা হয় যাতে সত্যজিৎকে ছোটো প্রতিপন্ন করা যায়। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র ব্যাপারে এটা লক্ষ্য করা গেছে, 'অভিযান'-এর ব্যাপারেও এটা লক্ষ্য করা গেছে। 'অভিযান', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র গভীর মানসিকতা লক্ষ্য করেও যেন কেউ লক্ষ্য করতে চান নি।

না, আমি একথা বলছি না যে ওই ছবি তিনটের তিনটেই, অথবা একটা, রায়ের মহৎ সৃষ্টি কিংবা দোষ ত্রুটিহীন, কিন্তু আমি ভীষণভাবে পীড়িত হয়েছি যখন দেখেছি অনেকে সংঘবদ্ধভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে ওগুলোর একটিও ছবি হয় নি, অর্থাৎ কয়েকটি বিশেষ দল আছে, যারা যে-কোনো দামে প্রমাণ করার চেষ্টা করে সত্যজিতের প্রতিভা অস্তমিত। শ্রীমজুমদার অথবা অন্য কোনো চিত্র সমালোচক সত্যজিৎকে ভাল বললেই তাকে বাজে সমালোচক বলে আক্রমণ করা হয়।

কলকাতা ও বোম্বেতে সিনেমার কিছু লোক আছেন, যাঁরা সব সময় চেষ্টা করছেন, প্যাঁচ কষছেন সত্যজিৎ যাতে ছবি করা বন্ধ করেন। পুরো ব্যাপারটা অবশ্য ঈর্ষাপ্রসূত। পৃথিবীর দশজন শ্রেষ্ঠ পরিচালকদের মধ্যে সত্যজিৎ যে একজন—এটাই তাঁদের গাত্রদাহের কারণ। সত্যজিৎকে বেকায়দায় ফেলার জন্যে যে-সব চিত্র-ব্যবসায়ীরা আগ্রহী, দুর্ভাগ্যবশতঃ, তাঁরাই এমন কিছু লোকের ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন যারা 'এফেকটিভ সিনেমা' সম্বন্ধে কিছুই জানে না। তবুও গত চার বছর ধরে তারা নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে সত্যজিৎকে ব্যর্থ প্রমাণ করার জন্যে। শুনেছি, রবীন্দ্রনাথের সময়েও এই রকম হয়েছিলো। পৃথিবীর যে কোনো স্বাধীন পরিচালকের ক্ষেত্রেও এ ঘটনা ঘটেছে।

এগুলির মধ্যে সব চেয়ে কুৎসিত ব্যাপার হোলো পৃথিবীখ্যাত একজন পরিচালককে খাটো করে দেখাবার জন্যে যে নোংরা অভিযান শুরু হয় সেগুলি। বলা হয়েছে, 'মহানগর' নাকি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বিরোধী ছবি। কথাটা ঠিক নয়, কেননা এইটাই একমাত্র ছবি যাতে দুটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান চরিত্র, মা ও মেয়েকে সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে।

অজ্ঞাত কিছু লোক, যাদের কেউ চেনে না, তারা হঠাৎ এই প্রসঙ্গে গোলমাল শুরু করে দিলো। যারা সিনেমার বিন্দুবিসর্গ পর্যন্ত জানে না, তারা এই নিয়ে হৈ-চৈ বাঁধিয়ে দিলো সরকারী দপ্তরে। আমার মনে হয়, এইসব অনর্থক হৈ-চৈ বাঁধিয়ে এ্যাওয়ার্ড কমিটিকে এমনভাবে বিষিয়ে দেওয়া হোলো যে, শেষ অবধি 'মহানগর'কে তৃতীয় পুরস্কার দেওয়া ছাড়া গতি রইলো না।

আরো দেখা যায়, সত্যজিৎ-বিরোধী প্রচারকর্তারা, কোনো সমালোচক যদি সত্যজিতের ছবি সম্বন্ধে ভালো কথা লেখেন, তাঁকে ভয় দেখাতেও তারা পেছপা হয় না।

আক্রমণকারীরা হয়তো জানে না, সত্যজিতের ছবি মানেই ভারতবর্ষে বিদেশী মুদ্রার আমদানি। স্টারলিং ও ডলারের ভারতীয় ভারসাম্যতাকে অনেকখানি পরিমাণে সামলে রাখা।

সত্যজিৎ সম্পর্কে আমি একটি বই লিখেছি। মনে হয় বইটি বেরোলে এই সত্যজিৎ বিরোধীরা বইটা ছিঁড়ে ফেলবেন, যখন দেখবেন যে সত্যজিতের ছবি করা সম্পর্কে খোলাখুলি কিছুই লেখা হয় নি।

আমি আশা করি সত্যজিৎকে ছোটো করে দেখার এই প্রচেষ্টা একদিন অদৃশ্য হবেই। আমি বলছি না যে সত্যজিতের প্রতিটি ছবিই ভালো ছবি অথবা সমান সৃজনশীলতাপ্রসূত।

'মহানগর' সম্পর্কে আমার অভিমত, সমসাময়িক দৃষ্টিকোণে 'মহানগর' একটি অপূর্ব মননশীল ছবি। মননশীল এই জন্যে যে 'মহানগর'-এ একটি সর্বজনীন আবেদন আছে। সব কিছু ধরে, 'মহানগর' একটি প্রকৃত চলচ্চিত্র।

সত্যজিৎ কি অ্যামেচার?

ডগলাস ম্যাকভে

১৯৫৯ সালের লণ্ডন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের মতো এত ভালো ফেস্টিভ্যাল আজ পর্যন্ত হয় নি। কাম্যুর অরফিউ নেগ্রো, বার্জম্যানের ব্রিংক অফ লাইফ, ডেনিস অ্যাঙারসের ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট, ইউ এস এ, ডনসকয়ের এ্যাট এ হাই প্রাইস—কিন্তু সব ছবিকে ছাপিয়ে গেছে, সব অভিজ্ঞতাকে ধূসর করে দিয়েছে সত্যজিতের 'অপুর সংসার'।

'পথের পাঁচালী' ও 'অপুর সংসার' সম্পর্কে বহু কিছু লেখা হয়েছে, এখন নতুন করে কিছু বলতে গেলে তা একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। রেনোয়া, ভি সিকা, ডনসকয়, ওজুঝু—এঁদের প্রভাবের কথা বার বার বলা হয়েছে, খোঁজা হয়েছে। গ্রেপস অফ র‍্যাথ-এর শেষাংশের প্রতিধ্বনি আমি 'পথের পাঁচালী'তে পেয়েছি। সত্যজিতের এ্যামেচারইজম সম্বন্ধে পল ডেনের আপত্তি ও অভিযোগ আছে। পাঁচালীর লং ট্রাক সট ডেনের মতে, এ্যামেচারিস্‌ম। আমার মনে হয়, এই লং ট্রাক সটগুলিই পাঁচালীর ঐন্দ্রজালিক ঐশ্বর্য। মিঠাইওয়ালার পেছনে শিশুটির দৌড়, ট্রেন সিকোয়েন্স, খেলনার বাক্স নিয়ে ঝগড়া করার পর দুর্গার পেছনে পেছনে মাঠের ওপর দিয়ে অপুর দৌড়ে যাওয়া—আরো কত ঐন্দ্রজালিক মুহূর্ত!

অপু জেগে উঠছে। দুর্গা একটি বিয়ে বাড়ি দেখছে। দেওয়ালের দিকে দুজনের দৌড়োদৌড়ি, ওদের ঠাকুমা, শাস্তিতে মারা যাওয়ার জন্যে ঘন অরণ্যে প্রবেশ—এগুলি কী এ্যামেচারইজমের লক্ষণ, প্রমাণ?

না, এর মধ্যে আনাড়ি হাতের ছাপ কোথাও নেই। মায়াবী দৃশ্যপুঞ্জ, ধূসর ক্লোজআপে উজ্জ্বল প্রকৃতি, এগুলি না দেখলে চিন্তা করা যায় না। সত্যজিতের প্রেরণা ছাড়া সুব্রত মিত্র হয়তো এভাবে ক্যামেরার কাজ করতে পারতেন না, রবিশঙ্কর এত চমৎকার সুরারোপ করতে পারতেন না, বিশেষ করে রাত্রি নামার সঙ্গে সঙ্গে যেখানে ছবির ক্লাইম্যাক্স উপস্থিত হচ্ছে, সেই অংশটি এক কথায় অতুলনীয়। ছবির শেষ দুটি রিলের কথা ধরুন, যেখানে দুর্গা মারা গেলো, শুধু ঠোঁট নেড়ে যে নিঃশব্দ কান্না, সুরের মীড়ে মীড়ে যে ক্রন্দন ধ্বনিত হয়েছে, তা বোধহয় চিরকালের জন্যে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

'পথের পাঁচালী' চুনিবালার আর 'অপরাজিত' হোলো করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। করুণার আশ্চর্য অভিনয়ের মধ্যে যে শীতলতা ফুটে উঠেছে, তা হয়তো কোনো কোনো জাপানি অভিনেত্রীর মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। অপুকে যেভাবে দেখানো হয়েছে, তার শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত, তা অন্য কোনো পশ্চিমী ছবিতে দেখানো হয় নি, অথবা দেখাবার চেষ্টা করাও হয় নি। সর্বজয়াকে আমরা যেভাবে বুঝেছি, তার ভাগ্যের মধ্যে যে সর্বজনীন সত্যকে প্রতিফলিত হতে দেখেছি তা ওজুঝুর 'টোকিও স্টোরি'র মধ্যে আমরা পাই নি।

সত্যজিতের ছবি ডকুমেন্টারি ছবির মতো নয়, সত্যজিতের ছবিতে এক আশ্চর্য মানসিকতা প্রতিবিম্বিত হয়, যে প্রতিবিম্বে আমরা নিজেদের ভেতরটা দেখতে পাই।

হতবাক সমালোচক

ইলিয়া সুকত

আমি প্রথম সত্যজিতের কথা শুনি মস্কোতে। সলিল চৌধুরী, বিখ্যাত ভারতীয় সঙ্গীত পরিচালক আমাকে বলেন, ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে 'পথের পাঁচালী' একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা।

সত্যজিতের ছবি দেখলে বোঝা যায়, জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থেকে ছবি করা কত কঠিন ব্যাপার। শোনা যায়, বাংলাদেশের যে কোনো তৃতীয় ব্যক্তিই একজন কবি কিংবা শিল্পী। কথাটার মধ্যে অনেকখানি সত্যি আছে। বাংলা সাহিত্য ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে প্রতিনিধিমূলক। কাজেই এখান থেকে ভারতীয় চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ নায়কের উদয় বিচিত্র কিছু নয়।

আলোচনা প্রসঙ্গে সত্যজিৎ বলেছিলেন, 'পথের পাঁচালী' করার আগে আমি কোনো ছবি করি নি। আমার ক্যামেরাম্যানও কোনো ছবি করে নি। আমার ছবিতে কোনো পেশাদার অভিনেতা অভিনয় করেন নি।

লিভিং আর্ট অফ ইণ্ডিয়া ইন দি ইউ এস এ-এর প্রদর্শনীতে এই তরুণ পরিচালকের ছবি দেখানো হোলো প্রথম। তারপরই তাঁর জয়যাত্রা শুরু হোলো। সবশুদ্ধ এগারোটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়ে পৃথিবীর অদ্বিতীয় মাস্টার পিস হিসেবে ছবিটি স্বীকৃত হোলো।

ছবিটির মধ্যে শুধু পারিবারিক ট্র্যাজেডি নয়, গ্রামীন দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্র, হতাশা, আশা, আনন্দ সব কিছু ফুটে উঠলো সুন্দরভাবে।

'পথের পাঁচালী'র আশা আকাঙ্ক্ষা চূর্ণ-বিচূর্ণ হোল 'অপরাজিত'তে। তবুও কিন্তু চূড়ান্ত কোনো অসহায়তা লক্ষ্য করা গেলো না। সত্যজিতের কথা মতো দেখা গেলো, 'অপরাজিত'র মধ্যে দানা বেঁধেছে বাঙালি পরিবারের ছবি আর মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা।

আশ্চর্য এক জীবনের উত্তাপ ছবিটির প্রধান সম্পদ। নিশিন্দেপুর আমাদের কাছে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে প্রকৃত শিল্পীর সহায়তায়।

সত্যজিৎ মনে করেন, এ পর্যন্ত তিনি যত ছবি করেছেন, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হোলো অপুর ত্রয়ী কাহিনী।

'মহানগর' ছবিতে আমরা দেখি, মধ্যবিত্ত জীবন মাকড়শার জালের মতো একটি জটিলতায় কী ভাবে আটকা পড়েছে। ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাস, সুখ, দুঃখ, বিষাদ সব কিছু যেন নির্দিষ্ট হয়ে উঠেছে ছবিটির মধ্যে।

এর মধ্যে অবশ্য সমাধানের কোনো ইঙ্গিত পরিচালক না দেখালেও আশাবাদীতার সুর আমাদের বিহ্বল করে তোলে।।

সত্যজিতের সাফল্যের গোপনীয়তা কী? তাঁর কৃতিত্ব কোথায়? এই প্রশ্নগুলি নিয়ে আজ অনেকেই কৌতূহলী।

অনেক বিদেশী সমালোচক মনে করেন, তিনি ভাগ্যের বরপুত্র, একজন স্বভাবজ প্রতিভা, নিজস্ব শিল্পকে ভালোবাসেন ও অরণ্যের সঙ্গীত শোনেন। কিন্তু কেউ যদি একবার ভেবে দেখেন, ভারতবর্ষে কোনো স্বাধীন চলচ্চিত্রকারকে কত কষ্ট স্বীকার করতে হয়, তাহলে বোঝা যাবে অরণ্যের সঙ্গীত শ্রবণ কত সুকঠিন কাজ।

ভারতীয় জীবনের সত্যতা, বাস্তবতা বর্ণনায় সত্যজিৎ সৎ বলেই আজ তাঁর কৃতিত্ব এত বেশি। শিল্পে জাতীয়তা বলতে যা বোঝায় তা একমাত্র সত্যজিতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

হতবাক সিনেমা সমালোচক আজ চেষ্টা করছেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের এই জাদুকরটির গোপন রহস্য কোথায় জানার জন্যে এবং সত্যজিৎ একের পর আর এক পর্যায়ে তাঁর শিল্পকে আরো উন্নত মানে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

জন রোজেলি



বাংলায় আমার সব কিছু। ওরা আমাকে হিন্দি ছবি করতে বলেছে, কিন্তু আমার পক্ষে হিন্দি ছবি করা সম্ভব নয়। আমেরিকান পরিচালক কেমন করে য়ুরোপীয় ছবি করতে পারেন আমি বুঝি না, বুঝতে পারি না। আমার কাছে সব চেয়ে দরকারি ব্যাপার হোলো ভাষা। শুধু ভাষা নয়, প্রকাশভঙ্গীও। একজন বাঙালী কথা বলার সময় যে ভাবে হাত নাড়েন তার সঙ্গে ভারতের অন্ত কোনো প্রদেশের লোকের মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমি যা জানি, তাই নিয়েই ছবি করতে পারি।

সত্যজিৎ চলচ্চিত্রের কবি। কারুর কারুর মতে মহাকবি। তবে একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করতে হবে, সত্যজিৎই একমাত্র ভারতীয় পরিচালক যিনি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছেন। কবি উইলিয়ামস-এর 'লোকালইজম এ্যালোন ক্যান লিড টু কালচার'-এর উজ্জ্বলতম প্রমাণ সত্যজিৎ।

দিল্লি বোম্বেতে সত্যজিতের ছবি দেখানো হয় ইংরিজি সাব টাইটেল দিয়ে, তবুও কিন্তু গ্রামবাংলার মানুষের কথাই তিনি সর্বজনীন করে বলেন।

যদিও খাঁটি বাঙালী, তবুও খাঁটি বাঙালী বলতে যা বোঝাবে রায় ঠিক তা নন। বাঙালী বলতেই অনেকে ভেবে বসেন, কোনো ছোট্ট টিকলো চোখ মুখের চেহারা, সেই জন্তেই মস্কো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে রায়কে দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম।

প্রায় ছ ফুট লম্বা, দশাসই চেহারা, ধীরে-সুস্থে ইংরিজিতে কথা বলা—মিলে মিশে মনে হয়েছিলো রায় বোধ হয় কোনো পৌরাণিক রাজপুত্র হঠাৎ সবুজ সিল্কের শার্ট পরে ইণ্টারন্যাশন্তাল ফিল্ম ডাইরেক্টরদের সভায় হাজির হয়েছেন।

রায় সদাই খুশি থাকেন। জনসংখ্যার মোট ২% অথবা •'২ লোক হয়তো রায়ের ছবি দেখেন, কিন্তু তাতেও রায় বোধ হয় দুঃখিত নন।

রায় মনে করেন না ভারতীয় ছবি ও পশ্চিমী ছবির মধ্যে কোনো তফাৎ আছে। ভারতীয় ছবির সম্পাদনায় যে মন্থর গতি আছে তা তার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

রায় ইমেজের কবি।

পিটার গ্রেহাম - এরিক শর্টার



সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা' বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবের সর্বোচ্চ পুরস্কার পেলেও ইংল্যাণ্ডের সমালোচকরা বিস্মিত হতেন না। অন্ততঃ সানডে টাইমস-এর পিটার গ্রেহাম আশা করেছিলেন 'চারুলতা' শ্রেষ্ঠ কাহিনীচিত্র হিসেবে চিহ্নিত হবে। তিনি ছাড়া আরো কেউ কেউ ওই আশা পোষণ করেন।

বার্লিন উৎসবের সর্বোচ্চ পুরস্কার পায় নি বটে, 'চারুলতা' কিন্তু সত্যজিৎ রায়কে শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান এনে দিয়েছে। 'মহানগর' ও 'চারুলতা', পর পর দু বছর তিনি শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান পেয়েছেন।

উৎসবের এই বিশিষ্ট সম্মান যে যোগ্য ব্যক্তিই পেয়েছেন, সে-বিষয়ে লণ্ডনের চিত্র সমালোচকদের মনে কোনো সন্দেহ ছিলো না।

সানডে টাইমস-এর পিটার গ্রেহাম লিখেছিলেন :

'চারুলতা'র প্রতি মুহূর্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কান চলচ্চিত্র উৎসব থেকে ছবিটি ফেরত পাঠানো হয়েছিলো—কথাটা যেন অবিশ্বাস্য! স্মরণীয় এই ছবিটি নিঃসন্দেহে উৎসবের সর্বোচ্চ পুরস্কার জয়ের অধিকারী।

ডেলি টেলিগ্রাফের সমালোচক এরিক শর্টার লিখেছিলেন :

বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবের হরেক রকম চেঁচামেচি আর ধর্ম ও স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে মত্ততার ব্যাপারের মধ্যে হঠাৎ ভারতের স্বর শোনা গেলো। ধীর, শান্ত এই স্বর—অথচ অর্থপূর্ণ।

আমরা কয়েকটি অতিবাহিত, শান্ত মুহূর্তের মুখোমুখি হয়েছি। মেয়েদের শরীরের নগ্নরূপ এখানে তুলে ধরা হয় নি। অন্তরঙ্গ আলিঙ্গনের দৃশ্য বৃহদাকারে উপস্থিত করারও দরকার হয় নি এখানে।

পরিচালক অকারণে আমাদের হাসাবারও চেষ্টা করেন নি।

এ সবের বদলে আমরা কী পেলাম ?

পেলাম একটি জীবনের প্রতিরূপ। সেই জাতির রুচিস্নিগ্ধ নম্রতা ও শোভনতাবোধের ছবি।

(এরিক শর্টার, ভারতের দ্বিতীয় প্রতিযোগী-চিত্র জেমস আইভরি কৃত 'সেক্সপিয়ারওয়ালা'রও প্রশংসা করেন, বলেন, ছবিটিতে সত্যজিৎ রায়ের প্রভাব স্পষ্ট।)

ছবি করি নিজের খুশিতে

ফিলিপ স্ট্রিক

১৯৫২ থেকে ১৯৬২-র মধ্যে ন' খানা ছবি শেষ করেছেন সত্যজিৎ। এর মধ্যে 'অপুর সংসার'কে সব চেয়ে বেশি দেখতে পাওয়া গেছে ইংল্যাণ্ডে, আর গোটা তিনেক ছবি কিছু সময়ের জন্যে দেখানো হয়েছিলো ন্যাশনাল ফিল্ম থিয়েটারে। 'অপুর সংসার' দেখার পর আমাদের ধারণা হয়েছিলো সত্যজিতের প্রতিভা অবহেলিত থাকবে না।

'অপুর সংসার' সম্পর্কে বহুবার আলোচনা হয়েছে, কাজেই নতুন করে আলোচনা করার মতো কিছু নেই। সত্যজিতের প্রথম ছবি 'পথের পাঁচালী' মুক্তি পেয়েছিলো নানা ঝঞ্ঝাটের ও আর্থিক কষ্টের পর। সত্যজিৎ ছবিটি থেকে খ্যাতি ছাড়া আর কিছু পান নি। অবশ্য এই খ্যাতির জন্যেই তিনি পরবর্তী ছবি, ১৯৫৬ সালে তৈরি 'অপরাজিত'র হাত দিতে পেরেছিলেন।

১৯৫৯ সালে সত্যজিৎ তাঁর ট্রিলজিতে শেষ ঘটনা বললেন। এর মধ্যেই তিনি শেষ করলেন 'জলসাঘর', 'পরশপাথর'।

সত্যজিতের যে-কোনো ছবি দেখা যাক না কেন, দেখা যাবে, প্রত্যেকটি ছবিতে ভারতবর্ষের চিরকালীন সঙ্গীতের প্রতীকী ব্যবহার ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে এক আশ্চর্য আত্মীয়তা। ছোটো ছোটো কিছু ঘটনা, কিছু কিছু কথাকে বিলম্বিত লয়ের মধ্যে ফেলে তিনি নিপুণভাবে গল্পের পরিবেশ ও মেজাজ গড়ে তুলতে পারেন। 'জলসাঘর'-এর সঙ্গে ব্যবসায়িক ভারতীয় ছবি 'আঃ'-র হয়তো কিছু কিছু মিল আছে, কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে 'জলসাঘর'-এর শিল্প অবদান কত বেশি প্রখর। 'জলসাঘর'-এর সঙ্গীত ব্যঞ্জনা শাক্সভরক-এর 'ফ্লুট এ্যাণ্ড দ্য এ্যারোতে'ও ব্যবহার করা হয়েছে। সত্যজিতের প্রত্যেকটি ছবিতেই এই বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়।

'পরশপাথর'-এ দেখা যায় একশো বছরের ইংরেজ রাজত্বে স্বরের ভূমিকা, পরশপাথরের নায়ক আমাদের অজান্তেই ফলসটাফিয়ান স্ফূর্তির প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। তুলসী চক্রবর্তীর অভিনয়ও অবশ্য এজন্যে অনেকখানি কৃতিত্বের দাবী করতে পারে। চারিত্রিক ডিটেল ও আঙ্গিকের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর এই ছবিটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

দেবী, পরশপাথর, জলসাঘর, অপুর ট্রিলজি—সর্বত্রই এক লিরিকের সুর শুনতে পাওয়া যায়।

'দেবী' যখন সানফ্রানসিসকো ফেস্টিভ্যালে পৌঁছয় নি, তখন আমরা অনেকেই হতাশ হয়েছিলাম। ভিস্যুয়াল টেকনিকের দিক থেকে বলতে গেলে 'দেবী' সত্যজিতের সর্বাধিক প্রাঞ্জল, সরল ছবি। ছবিটির মধ্যে যে দীর্ঘসূত্র নীরবতা আছে, আবেগের যে গভীরতা আছে, চরিত্রের যে আশ্চর্য রূপায়ণ আছে, তাতে করে 'দেবী'কে এক একক-শিল্প বললে কিছুমাত্র অতিরঞ্জন করা হয় না।

শুনেছিলাম সত্যজিৎ বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী' ছবি করবেন বলেও ঠিক করেছিলেন। কিন্তু অভিনেতা অভিনেত্রীদের সঙ্গে নানা ধরনের মতান্তর উপস্থিত হওয়ায় ও টেকনিক্যাল কিছু অসুবিধের জন্যে এই আশা তাঁকে পরিত্যাগ করতে হয় ডিসেম্বরে, ১৯৬০ সালে। এই সময় সত্যজিৎ বলেছিলেন, আমি ছবি করি নিজেকে খুশি করার জন্যে।

এরপর সত্যজিৎ 'মণিহারা' ছবি করেন। 'মণিহারা' দেখার সৌভাগ্য এদেশে আমাদের আদৌ হবে কিনা জানি না, কেননা ভারত সরকার 'দুই কন্যা'র সঙ্গে জুড়ে দিতে চেয়েছিলেন 'মণিহারা'কে এবং সত্যজিৎ তাতে রাজি হন নি পশ্চিমী দর্শকের কাছে দৈর্ঘ্যের ক্লান্তির কথা ভেবে। 'মণিহারা' সম্পর্কে আমার ধারণা, এতে সত্যজিৎ-এর বিষয় বাছা সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যেতো।

'পোস্ট মাস্টার' ছবিও সত্যজিৎ এলাকার মধ্যে। শিশু মনস্তত্ত্ব, বুদ্ধিজীবী কাপুরুষতা, গ্রামীণ পরিহাস একত্রে গ্রথিত হয়েছে পোস্ট মাস্টারে।

'সম্পত্তি' গল্পটি অপেক্ষাকৃত নিম্ন মানের। টেমিং অফ দ্য শ্রু-র চেকভিয়ান রূপটাই যেন 'সম্পত্তি'র মধ্যে বড়ো বেশি চোখে পড়ে। তবে 'সম্পত্তি' ছবি প্রমাণ করে সত্যজিতের প্রতিভা কত বিচিত্র, কত বহুমুখী।

নেপালী লোক-সঙ্গীতের অনুকরণে সত্যজিতের নিজের মিউজিক দেওয়া ছবি 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' হিমালয়ান কুয়াশার মেজাজটাই যেন ধরে রেখেছে।

সত্যজিৎ রায়ের অভিযানে

মারি সিটন

অনেকেই মন্তব্য করেছেন সত্যজিৎ রায়ের মত একজন পরিচালকের 'অভিযানে'র মত বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি করে শৈল্পিক দক্ষতার অপচয় করা উচিৎ হয় নি। অনেকেই 'অভিযান' সম্পর্কে বলেছেন, কাহিনীটা মোটামুটি একটা 'মা র পি টে র ছবি' হবার উপযুক্ত।

আমি এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত নই। বেশীর ভাগ ছবিতেই, বিশেষত ভারতীয় ছবিতে জীবনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 'মহৎ' 'মহৎ' সব বিষয়-বস্তুও ছবির পর্দায় নিতান্তই কৃত্রিম কিম্বা প্রচারমূলক হয়ে দাঁড়ায়। অথচ 'অভিযানে'র মত কাহিনী নিয়ে একটা গতানুগতিক গয়ং গচ্ছ ধরনের ছবি তৈরি করা যেত। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে, ছবিটি একটা গুরুত্বপূর্ণ ছবিতে পরিণত হল। কেননা মানবিক মূল্য-বোধের গভীরতায় ছবিটি সম্পৃক্ত। একটা শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুটিই বড় কথা নয়। বিষয়টির কিরূপ শৈল্পিক ব্যবহার হয়েছে তারই উপর নির্ভর করছে সমগ্র শিল্পটির সাফল্য বা অসাফল্য।

শেক্সপীয়রকে নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁরা ছাড়া অনেকেই হয়ত জানেন না যে, শেক্সপীয়রের অনেক আগেই 'হ্যামলেটে'র কাহিনী রচিত হয়েছে। মহাকবি সেই অসংস্কৃত মোটা মেলোড্রামা ধরনের কাহিনীটিকে হ্যামলেটের এক জটিল মানসিক সংঘাতে রূপান্তরিত করলেন। কোনও এক পুরাকাহিনীর রাজকুমার সেই হ্যামলেট আজও একজন 'বাস্তব' নায়ক হিসাবে জীবিত—একজন 'নায়ক' যিনি তাঁর 'সত্তা' ও 'মনের' দ্বন্দ্বে বিক্ষত—যিনি তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েও বাস্তবে মানসিক দ্বন্দ্বে স্থানু। শেক্সপীয়র 'হ্যামলেট' সৃষ্টি করেন মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে। আজ সারা পৃথিবী জুড়ে আবার এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে; সমস্ত সা মা জি ক কাঠামোর চেহারা চরিত্রেরই পরিবর্তন এসেছে। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন কোণে, যেখানে অভিজাত শ্রেণী এখনো মুছে যায় নি, সেখানেও এই উঁচুতলার মানুষেরা আগের তুলনায় অর্থ-নৈতিক আর সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক নেমে গেছেন। অপর দিকে, যেখানে ধন-তান্ত্রিক কাঠামো পুরোমাত্রায় বজায় আছে, নিচু তলার মানুষেরা বুদ্ধি আর ক্ষমতার জোরে অর্থনৈতিক কৌলীন্য লাভ করছে।

সত্যজিৎ রায়ের অভিযানের নায়ক নরসিং। বংশগত বিচারে সে নাকি রাজপুত, সামাজিক আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নামতে নামতে 'ট্যাক্সি ড্রাইভারে' পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে নরসিং-এর নতুন আবিষ্কৃত বন্ধু জোসেফ এক হরিজনের নাতি। জোসেফ আর নরসিং-এর ঠাকুর্দারা একই গ্রামের মানুষ। একজন হরিজন থেকে খ্রীস্টান হয়েছে আর একজন অভিজাত রাজ-পুত (এখানে শ্রীরায়ের গভীর দৃষ্টি ভঙ্গীর পরিচয় পাই। তিনি নরসিংকে সাদা চামড়ার আর জোসেফকে কালো চামড়ার দেখালেন, এই রঙের বৈষম্য বহুযুগ আগের আর্যদের দ্রাবিড় বিজয়ের এবং রঙের ভি ত্তি তে গোত্রভেদের ইঙ্গিতবাহী)।

সেক্সপীয়রীয় যুগ সমস্ত ইয়োরোপ ব্যাপী দ্বিধাবিক্ষত ক্রুদ্ধ যুবকের জন্ম দিয়েছিল, যার প্রকাশ হ্যামলেটে। আজও সারা পৃথিবী এই বিভিন্ন খাতের রূপান্তরের যুগে জন্ম দিয়েছে ক্রুদ্ধ যুবকের, যারা বিগত আর আগত যুগের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে সমতা রক্ষায় অক্ষম। এশিয়া আফ্রিকার নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত সমাজের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে ঐতিহ্যের ভগ্নদশা, এই বিগতযুগের ভগ্নস্তূপের



ওপর দাঁড়িয়ে আজ তাদের প্রত্যক্ষ করতে হচ্ছে কুৎসিত অসৎ ব্যবসায়ীকে (যেমন অভিযানে সুখারাম), দেখেছে অমানবতা। আফিমের চোরাচালানকারী সুখরামের কাছ থেকে নরসিং-এর অভিজ্ঞতা।

যদিও 'অভিযান' একটি বর্ণনাবহুল ছবি, শ্রীরায় ছবিটিকে নরসিং-এর অনুভূতি আর আবেগের গভীরতায় পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছেন। নরসিং-এর অন্তর্দ্বন্দ্ব—একদিকে তার সোজা পথে চলার বাসনা, অন্যদিকে অন্যায়ের চোরাগলি দিয়ে আসা কাঁচা পয়সা। 'অভিযানে' সত্যজিৎবাবু 'যে কোনো জায়গায় দেখা যেতে পারে' এমন তিনটি চরিত্র এঁকেছেন। এক, সুখারাম—সফল ব্যবসায়ী, প্রকৃতপক্ষে নরকের জীব; দুই, গোলাপী যে ধর্ষিতা বলে সমাজচ্যুত, তাকে রক্ষা করার জন্যে কেউ নেই, শুধু অপমান, নিন্দা করার জন্যে সবাই উন্মুখ, জীবন সম্পর্কে যার মোহভঙ্গ হয়েছে; তিন, নরসিং—এই রাজপুত সন্তান, যার বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মোহভঙ্গ সমাপ্ত, বর্তমানের বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিতে পারছে না। এর মিল পোল্যাণ্ড কিম্বা বৃটেনের যে কোন অভিজাত সন্তানের মধ্যেই পাওয়া যাবে। নরসিং প্রতি মুহূর্তেই তার 'ছেত্রী' বংশোদ্ভবের কথা সগর্বে ঘোষণা করেছে, কিন্তু বাস্তব জীবনে পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় তার সামাজিক মর্যাদা খুঁজে পাচ্ছে না। নরসিং ভদ্রলোক হতে চায়, কিন্তু শিক্ষাভাব বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তার রাজপুত 'শৌর্য' এযুগে তাকে শুধুমাত্র কুচক্রী নরকের জীবদের সঙ্গে বিড়ম্বনার মধ্যেই টেনে এনেছে।

তবু সত্যজিৎবাবু তাঁর বক্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। তিনি কখনোই একথা বলতে চান নি যে এ সমাজে টিঁকে থাকতে হলে অসৎ হতেই হবে। অপরপক্ষে সত্যজিৎবাবুর যে বক্তব্য, তা হল, এই দূষিত সমাজের মধ্যে ও যার মাথা উঁচু করে রুখে দাঁড়াবার ক্ষমতা আছে সে জয়ী হবেই। আজ Wages of fear-এর পরিচালক ক্লুজটের মত অনেকেই আছেন যিনি 'অভিযানে'র কাহিনীর সমাপ্তি টানতেন এক দুঃসাহসী নায়কের মহৎ মৃত্যুতে। কিন্তু শ্রীরায় একজন মানবতাবাদী। তাই নরসিং-এর দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি আশার আলোকে উদ্ভাসিত। এক আশা, যা তাকে গোলাপীর সঙ্গে একটা স্থায়ী জীবনের ইঙ্গিত দেবে।

চলচ্চিত্রের অন্যান্য গুণে 'অভিযান' অসাধারণ সফল। আলোকসম্পাত ও ফোটোগ্রাফির ক্ষেত্রে 'অভিযান' বোধহয় শ্রীরায়ের এযাবৎ কালের সমস্ত ছবির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁর সঙ্গীত অসামান্য সৌন্দর্যবাহী। অভিনয় আশ্চর্য সফল, ছবির চরিত্র ও বক্তব্যকে চলচ্চিত্রের সমস্ত গুণের মাধ্যমে অপরূপ শিল্পসম্মত করা হয়েছে।

'অভিযা'ন হয়ত ফিল্ম ক্লাবের একটি সৌখীন ছবি নয়। হয়ত কোন পুরস্কার এর জন্যে তোলা থাকবে না। কিন্তু এই প্রথম ছবিটির চরিত্র ও বক্তব্যের গুণে শ্রীরায় বৃহত্তর দর্শকদের সঙ্গে নিবিড় সান্নিধ্য স্থাপন করতে পেরেছেন। 'অভিযানে'র একটা নৈতিক শক্তি আছে, তাই 'অভিযান' আজকের হতাশাগ্রস্ত ক্রুদ্ধ যুবকের জীবনদর্শনের মূর্ত প্রতিবাদ।

সিদ্ধার্থের কলকাতা

সত্যজিৎ রায় 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবিতে কলকাতার যুবককে সামনে এনেছেন। নগরজীবনের ক্রমবর্ধমান হতাশার বিরুদ্ধে দাঁড় করেছেন সার্থকনামা নায়ক সিদ্ধার্থ—এক অনুভূতিপ্রবণ, অন্তর্মুখীন যুবক—এ যুগের শূন্যগর্ভতার মধ্যে দাঁড়িয়ে যে চাকুরির অন্বেষণে ঘুরছে।

এ ছবি আধুনিক ভা র তে র। স্বাধীনতাত্তর কালের আশাভঙ্গের ভার আমাদের জনগণের হৃদয়ে। শ্রীরায় তাঁর বক্তব্যকে চলচ্চিত্র মাধ্যমের সর্বোত্তীর্ণ বুদ্ধিমত্তা ও শিল্পচেতনার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। কোন তথাকথিত 'আধুনিকতা' নেই, কোন তথাকথিত 'নব্যধারা' প দ্ধ তি র চমক নেই। ছবিটির এমন কোন অংশ নেই যা আপনার কা ব্যি ক বোধকে নাড়া দেবে না।

ছবিটি আবহসঙ্গীতের মাধুর্য অপরূপ ইঙ্গিতবাহী। পাখির বাজারের গণ্ডগোল। রাত্রির দুঃস্বপ্নের মধ্যে সমুদ্রের নৈঃশব্দ্য! দূরের বিশাল জনসভার প্রতিধ্বনির সঙ্গীত, প্রতিটি ধ্বনিসংকেত ছবিটির পটভূমিকাকে নতুনতর রূপ দিয়েছে।

শ্রীরায়ের সমস্ত শ্রেষ্ঠত্বেরই রূপরেখা আমরা এখানে পেয়েছি। দৃশ্যের বাস্তবতা, চরিত্র নির্বাচন, যা পরিচালকের হাতে বক্তব্যর পরিস্ফুটনে সফল। গতি এবং ভাবনা, সম্পাদনা—সব মিলিয়ে ছবিটিকে একটি সামগ্রিক ও সম্পূর্ণ শিল্পকর্মে রূপান্তরনে সফলকাম রূপ পাওয়া গেছে।

এই ছবিটি আর একবার প্রমাণ করল যে দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে চলচ্চিত্র সাধনার মাধ্যমে শ্রীরায় প্রত্যয়ী পরিণততর ভূমিকায় এসেছেন। ছবির সূচনাতে নেগেটিভের মাধ্যমে সিদ্ধার্থের বাবার মৃত্যুদৃশ্যর বিয়োগব্যথা অপরূপ শিল্পসুষমায় মণ্ডিত। কোন মেকী চমকের স্থান নেই এখানে।

চেতনাপ্রবাহের ব্যবহার চলচ্চিত্রের অর্থবাহী হয়েছে। একটি যুবকের তার রাজনৈতিক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিপ্লবী ভায়ের গিলোটিনের দৃশ্য, বোনের অফিসের বস্-র বাড়িতে বসে তাকে গুলি করার কথা ইত্যাদির দৃশ্যের কথা স্মর্তব্য।

যুবকের নিস্পৃহ দায়িত্বহীন আমলাতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অনেক বেশী গভীর ও মৌলিক—তার চারপাশের তথাকথিত সৌখীন টেবিল-চাপড়ানো রাজনৈতিক বন্ধুদের তুলনায় অনেক বেশি মৌলিক। এখানে শুধুমাত্র একটি ফটোগ্রাফিক সিকোয়েন্সের মাধ্যমে তার বিচ্ছিন্নতাকে দেখানো হয়েছে।

ছবিটির শেষ দৃশ্যে—সিদ্ধার্থ এক মফঃস্বল গ্রামে 'সেলসম্যানের' চাকুরি নিয়ে এসেছে—আবার মৃত্যুদৃশ্য এল—এবার 'পজিটিভে'। একটি যুবকের একটি অংশের মৃত্যু হল। এই সময়ই তার আকাঙ্ক্ষিত পাখির গান শুনতে পেল—সে নিজেকে খুঁজে পেল। এ কোন গতানুগতিক 'আশা'র সুর নয়, কল্পনা ও সত্যতায় মধ্যে জড়ানো জীবনের সংবাদ।

পথের পাঁচালী

মারি সিটন



সাহিত্যে ট্রিলজি বহুদিনের একটি প্রচলিত ব্যাপার হলেও চলচ্চিত্রে মাত্র তিনটি ট্রিলজি সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীর তিনজন খ্যাত চিত্র-পরিচালকদের হাতে। অবশ্য এর মধ্যে একটি আবার অসমাপ্ত রেখে চিত্র-পরিচালক মারা গেছেন।

রাশিয়ায় দুটি ট্রিলজি তৈরি হয়েছে। ডনসকয়-এর লেখক ম্যাকসিম গোর্কির জীবন-কাহিনীকে ভিত্তি করে তোলা ছবি। দ্বিতীয়টি আইজেনস্টাইন 'আইভান দ্য টেরিবল'-এর প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় নিয়ে, তৃতীয় অধ্যায় অসমাপ্ত রেখে পরিচালক মারা গেছেন, আর সত্যজিৎ রায়ের ট্রিলজি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাচালী'র কাহিনীকে উপজীব্য করে।

ট্রিলজির একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য আত্মজীবনীমূলক ঘটনাস্রোতে জীবনের এক গভীরতায় পৌছোনো, সেদিক থেকে সত্যজিৎ রায়ের এ ট্রিলজির তিনটি ছবিই ভারতীয় সামাজিক চলচ্চিত্রের এক বিশেষ অবদান।

ভারতীয় চলচ্চিত্রে এর আগে যা হয়েছে তা শুধু এক ভাসা-ভাসা ব্যাপার। এত গভীরতার গৌরব আগে কোনো ভারতীয় চলচ্চিত্র পায় নি। এই ছবি ভারতীয় জীবনের একমাত্র যথার্থ রূপায়ন এবং অকৃত্রিম।

বিভূতিভূষণের উপন্যাস গ্রামবাংলার পটভূমিতে একজন শিশুর আত্মজীবনীমূলক বিকাশের ঘটনা।

১৯৩০ সালের প্রথম দিকে বিভিন্ন প্রকাশকের কাছ থেকে 'পথের পাচালী' বিরূপ সমালোচনা পেয়ে ফেরৎ আসে। প্রকাশকরা খোঁজেন জমজমাট গল্প আর ঘটনা সংঘাত। বিভূতিভূষণের এই উপন্যাসে তেমন কিছুই তাঁরা পান নি। পরে অবশ্য এক বাংলা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পর যখন বই হয়ে বেরোলো তখন উপন্যাস সমাদৃত হোলো। অপু দুর্গার মায়াময় শৈশবের মধ্যে পাঠক যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো বন্দী হয়ে পড়েন।

তারপর ১৯৫৫ সালে 'পথের পাচালী' চলচ্চিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। সত্যজিৎ রায়ের প্রথম ছবি এবং অপু ট্রিলজির প্রথম অধ্যায়।

এর আগে শ্রীরায় কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করতেন এক বিজ্ঞাপন সংস্থায়। কলকাতার শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল পরিবেশে তাঁর জন্ম। পারিবারিক সূত্রে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার তিনি পেয়েছেন। প্রায় বন্ধুদের কাছে তিনি বলতেন একটা ছবি করার ইচ্ছার কথা। একটা ভাল ছবির কথা অনেকদিন তাঁর মনে ছিল।

সত্যজিৎ বলেছেন—'পথের পাচালী' করেছি শুধু নিছক জীবনের কতকগুলি রূপ তুলে ধরার জন্যে। 'পথের পাচালী'তে পেয়েছি মহান মানবিকতার সঙ্গে এক কাব্যিক সুর, যা জীবনের চিরন্তন সত্য। এতে ইন্দির ঠাকরুণের ভূমিকায় বৃদ্ধা চুনীবালার অভিনয় অবিস্মরণীয়। রবিশঙ্করের আবহসঙ্গীত সমস্ত ছবিটির মর্মমূলে ব্যাপ্ত। শীতের পরিবেশ, গ্রামের পুকুর, ঝরে পড়া পদ্ম পাপড়ি—সব মিলিয়ে শ্রীরায়ের সৃষ্টি অনন্ত।

অপুর সংসার সারল্যের প্রতারণা

পল ভি বেকলি

অপুর সংসার সত্যজিৎ রায়ের তৃতীয়, অর্থাৎ অপুর ত্রয়ী-চলচ্চিত্রের (ট্রিলজি) মধ্যে শেষ ছবি। এই ট্রিলজির মধ্যে আছে 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত'। নিঃসন্দেহে আমরা এক মহান শিল্পসৃষ্টির মুখোমুখি হলাম এবং আমাদের কালের এক ধ্রুপদী চলচ্চিত্র বললেও খুব বেশী বাড়িয়ে বলা হবে না। অপু তার জীবনের এক জটিল সমস্যা নিয়ে এসেছে এই ছবিতে। প্রথমে তার শৈশব, তার কৈশোর ও স্কুল জীবনের ঘটনা এবং তারপর 'অপুর সংসার'। এটা আজ প্রমাণিত হচ্ছে যে ভারতীয় চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রায় বস্তুতান্ত্রিক চলচ্চিত্রের সার্থক রূপকার। খুব সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে এমন এপিক সৃষ্টি চলচ্চিত্রে এক দুর্লভ সংযোজন।

আপাতদৃষ্টিতে সারল্যের একটা প্রতারণা আছে; সহজকে খুবই সহজ মনে হয়, কিন্তু সহজ হওয়া সহজ নয়, তাই সহজ কথাও যায় না বলা সহজে। এই ছবিতে যে সহজ সরলতা বক্তব্যের মধ্যে ধরা পড়ে তা কিন্তু ছবির শিল্পকর্মে সিদ্ধির গুণ। ছবিটি মোটেই সাধারণ নয়। প্রতিটি দৃশ্যের স্বচ্ছতা এক অনিবার্য দর্শনীয় ব্যাপার। যেন মনে হয় কোন রকম প্রয়াস না করেই এ-ছবি বোঝা যায়। মোটেই তা নয়। অবশ্য সার্থক শিল্পের এটাই একটা চাতুরী। চলচ্চিত্রামোদীরা বুঝতে পারবেন শ্রীরায় কোন আশ্চর্য সিদ্ধির স্তরে পৌঁছে গেছেন। চলচ্চিত্র নির্মাণে তাঁর আদর্শ সংযম অবাক হবার মতো।

এবার ছবির কথায় আসা যাক। একটা খোলা দৃশ্যপটে অপু ঘুমোচ্ছে, হঠাৎ বৃষ্টির ছাট এসে তাকে ভিজিয়ে দেয়; বৃষ্টি ভেজা অপু কাঁপতে কাঁপতে কালির বোতল উপুড় করে দেয়, বিছানার চাদরে পড়ে। অপু ঘুম ভাঙার পর এটা আবিষ্কার করে। বিছানার তলায় তার ভাঁজ করা সার্ট ছিলো, তাড়াতাড়ি বিছানা তুলে দেখে যে সার্টে কালি পড়ে নি; অপু দুশ্চিন্তা মুক্ত হয়।

অপু তারপর দাড়ি কামায়। এর মধ্যে বাড়িওয়ালাকে দেখা যায়। একুশ টাকার মাসিক ভাড়ার বাড়ি। চাকরির ধান্ধায় ঘুরে বেড়ায় অপু।

অপুর এক বন্ধু অপুকে নিয়ে গ্রামে যায় এক বিবাহানুষ্ঠানে। দৃশ্যপটে দেখা যায়, এক পরিচ্ছন্ন নদীতট রেখা। নদীবক্ষে নৌকো ভেসে যাচ্ছে। অপু কবিতা আবৃত্তি করছে। কনের মা অপুকে এই প্রথম দেখলেন। তাকে দেখেই তার ভগবান কৃষ্ণের মূর্তির কথা মনে পড়ে। বর পাল্কীতে চড়ে বিবাহ-বাসরে এসে হাজির। প্রসেশান করে ব্যাণ্ডবাদক বৃটিশ পোশাকে সঙ্গে এসেছে। বাজাচ্ছে এক বিদেশী গানের কলি 'ফর হি'স এ জলি গুড ফেলো'...করুণ, উদ্ভট, আশ্চর্য—কিন্তু সব মিলিয়ে এক সুন্দর দৃশ্য। এই হচ্ছে শ্রীরায়ের মহান সংবেদনশীলতা। এক উল্লেখযোগ্য অনুভূতির পরিধি, যার সুরু কমিক দৃশ্য থেকে ট্র্যাজিক দৃশ্যান্তর পর্যন্ত। সুন্দর থেকে উদ্ভট। খুব উন্নত সচেতন মন না হলে এটা সম্ভব নয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রীতিতে অভিজ্ঞ বলে এটা হয়েছে। এদিকে বর মানসিক দিক থেকে অসুস্থ, সেটা ধরা পড়ে কনের বাড়িতে এসে পাল্কী থেকে নামার সময়। বিয়ের ওড়না কামড়ে ধরে বর মাথা নাড়তে সুরু করে, ঠিক যেন হাওয়ার মধ্যে টোম্যাটো ঘোরার মতো। বর তখন বিয়ের পিঁড়িতে বসতে নারাজ। এই দুঃসময় অপুর বন্ধু অপুকে বিয়ে করতে অনুরোধ করে মেয়েটিকে, তা না হলে তার কন্যাদায়গ্রস্ত আত্মীয়কে এক সামাজিক কলঙ্কে অনূঢ়া মেয়েটির জন্য বিপদগ্রস্ত হতে হবে।

আরেক সুন্দর দৃশ্য যখন শোবার ঘরে অপু মেয়েটিকে খুব বিমূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি জীবনে কষ্টের

মুখোমুখি হতে পারবে দরিদ্র স্বামীর জন্যে? মেয়েটির উত্তর খুব ছোট্ট, হ্যাঁ। এক গভীর হৃদয়স্পর্শী প্রেমের দৃশ্য এই ছবির। শ্রীরায়ের প্রায় প্রতিটি দৃশ্যগ্রহণই এক-একটা উজ্জ্বল রত্ন। আদর্শ শিল্পরুচি ও পরিমিতি বোধে পূর্ণ তাঁর প্রকাশভঙ্গি। কলকাতার এক হতশ্রী ভাঙ্গা বাড়িতে অপুর স্ত্রী অর্পণার প্রবেশের দৃশ্য—এক টুকরো স্মরণীয় দৃশ্য। অপর্ণা এক শব্দহীন পরিবেশের মধ্যে দিয়ে চার দিক তাকিয়ে দেখে নিচ্ছে; তাই মনে হয় শ্রীরায়ের কলাকৌশল এত বেশি ব্যঞ্জনাময়, এত বেশি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত-বহ যে সব সময় তাঁর ছবির 'সাব টাইটেল' খুব দরকার। অপর্ণা দেখছে জানলা দিয়ে ধোঁয়াচ্ছন্ন রেলইয়ার্ড, ক্যামেরার চোখে তখন জানলার বাইরে দিয়ে পর্দার পাশে সজল চোখের উজ্জ্বল মুখটি ধরা পড়ে। এই রকম টুকরো টুকরো অনেক দৃশ্যের মধ্যে ধরা শ্রীরায়ের এক কবি মনের অতলস্পর্শী গভীরতা। অপুর ত্রয়ী জীবন চিত্রের মধ্যে মানব জীবনের সমস্ত সুর ব্যাপ্ত। কাব্যিক বস্তুতান্ত্রিকতা যার স্মরণীয় লক্ষণ হয়ে এই ত্রয়ী চিত্রের মধ্যে উপস্থিত।

ফিল স্ট্রাসবার্গ — চলচ্চিত্রে ভ্রূকুটি: দেবী

খুব ভালো ভাবে সত্যজিৎ রায় জানতেন যে কী সাংঘাতিক বিষয় নিয়ে তিনি 'দেবী' চলচ্চিত্রায়িত করছেন। সাংঘাতিক মানে, দেশের মানুষের কুসংস্কার ও অন্ধধর্ম বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করেছেন।

প্রথমে তো এ ছবি বিদেশে রপ্তানীর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ছিলো, কারণ হিসাবে বলা হয়েছিল যে এতে জাতীয় জীবনের মর্যাদা হানি হবে। অবশ্য ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু পরে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন আমলাতন্ত্রের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে।

'দেবী' শতাব্দী প্রাচীন হিন্দু বিশ্বাসের এক ট্র্যাজেডী। এক সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ পরিবারের গৃহকর্তা কালী ভক্ত। তিনি স্বপ্নাদেশ পান যে তাঁর পুত্রবধূ আদ্যাশক্তির অংশ স্বয়ং দেবী কালী। তাই এই পূর্ণ যৌবনা বধূমাতাকে যৌবনে যোগিনী সাজালেন। কলকাতার কলেজে পড়া পুত্রের সঙ্গে পিতার বিরোধ। এখান থেকে চলে যাবার জন্যে এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে দেবীর স্বামী তাকে বলে। ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে পালিয়ে দুজন যুবক যুবতী জীবনকে ভোগ করতে চায়। কিন্তু ধর্মীয় সংস্কারের নাগপাশ ছিন্ন করতে না পেরে নিয়তিকে মেনে নিতে হয়। অবশেষে দেখা যায় পুত্রবধূর জীবনে ট্র্যাজেডী। উন্মাদ হবার মধ্যে দিয়ে শেষ হয় একটি গৃহবধূর জীবনের করুণ পরিণতি।

গভীর নাটকীয় অন্তঃসংঘাতকে সত্যজিৎ মূর্ত করেছেন তাঁর পরিমিত শিল্পবোধ দিয়ে। অন্ধ বিশ্বাসের যূপকাষ্ঠে বলি হয় যে জীবন তার সংঘাত প্রবল। সত্যজিৎ যেন সর্বকালের মৌল সমস্যা তুলে ধরেছেন।

ওয়াজদার সঙ্গে সত্যজিৎ

রায় : আচ্ছা, মিঃ ওয়াজদা, আপনি এখন কিসের ওপর ছবি তুলছেন ?

ওয়াজদা : খুব আস্তে আস্তে এগোচ্ছি। বর্তমানে আমি একটা ঐতিহাসিক গল্পের ওপর ছবি করছি। যদিও এটা আমার বিষয়বস্তু নয়।

রায় : তাহলে কিসের জন্যে তুলছেন ?

ওয়াজদা : কারণ গল্পটা পোল্যাণ্ডে খুবই জনপ্রিয়। প্রায় তিন বছর নীরব থাকার পর আমার মনে হল, আবার দর্শকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা উচিত।

রায় : হ্যাঁ, সেটা ঠিক। আচ্ছা, আপনার প্রথম ছবি কি 'জেনারেশন' ?

ওয়াজদা : স্বাধীনভাবে বলতে গেলে সেটাই প্রথম।

রায় : হ্যাঁ, আমি ছবিটি ভেনিসে দেখেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল অসাধারণ।

ওয়াজদা : মিঃ রায়, আপনাকে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই।

রায় : হ্যাঁ করুন।

ওয়াজদা : আচ্ছা, আপনি তো ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পরিচালক, আপনি কি বলতে পারেন বাইরের কোন সাহায্য (এমন কি কোন প্রদেশ) ব্যতীত স্বাধীন ভাবে ছবি করা সম্ভব ?

রায় : দেখুন, আমি কোন রকম সাহায্য ব্যতীত ছবি নির্মাণ করে থাকি। সুতরাং আমার ছবিতে ঐ ধরনের কোন প্রশ্ন ওঠে না। সেগুলি নানান প্রযোজক ও পরিবেশকরা সাহায্য করে থাকেন। যেমন আমার পথের পাঁচালী ছবির কথা ধরুন। প্রথমে নিজের পকেট থেকে পয়সা খরচ করে করতে আরম্ভ করেছিলাম। তারপর টাকা-কড়ির টানাটানি আরম্ভ হয়ে গেল। আমরা ভেবেছিলাম ছবি করার পরিকল্পনা ছেড়ে দেব। শেষে একজন ছিলেন, যাঁর সরকারী মহলে হাত ছিল, তাঁর চেষ্টায় সরকারী সাহায্য পেলাম। আচ্ছা চিত্রনাট্যের ব্যাপারে আপনার কি মত ?

ওয়াজদা : চিত্রনাট্য আমি নিজেই করি। যদিও সব সময় আমি খুশী নই। কখনো এমন হয় যে চিত্রনাট্য ভাল হল, কিন্তু ঠিক অভিনেতা পাওয়া যায় না। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মঞ্চের অভিনেতাদের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। ওয়ারশ'র কথা ধরুন, সেখানে কুড়িটা থিয়েটারের সংস্থা আছে। আর সেখানে এক লাখ লোকও থাকে না।

রায় : আপনি সাধারণত ক'বার টেক করেন ? আমাকে বেশির ভাগ সময় একটা নিয়েই খুশী থাকতে হয়। কারণ কাঁচা ফিল্মের অভাব।

ওয়াজদা : আমরা অনেক ক্ষেত্রেই একই ব্যাপার করি, যদিও ছবির ক্ষেত্রে একটা বিশেষ ধারণা থাকা উচিত। ছবি করার আনন্দ তিনবার উপভোগ করা যায়, প্রথমত যখন চিত্রনাট্য লিখছি, দ্বিতীয়ত যখন স্যুটিং করছি, আর তৃতীয়ত যখনএডিট করছি।

রায় : হ্যাঁ। এমন কি খুব পরিষ্কার মনোভাব নিয়ে ছবি করলেও সম্পাদনার সময় ছোটখাট অনেক কাজ করবার থাকে।

ওয়াজদা : ঠিক বলেছেন।

রায় : এটা শক্ত নয়, কখনই শক্ত নয়, বিশেষত কথা বলার ব্যাপারে।

ওয়াজদা : আমি স্বীকার করি।

রায় : আপনি যখন সম্পাদনা করছেন তখন অনেকখানি আপনার ওপর নির্ভর করছে ; আর আপনি অভিনয়কেও সংযত করতে পারছেন।

ওয়াজদা : ঠিকই।

রায় : তাহলে তখনও অনেক কিছু বাকি আছে। কিন্তু বাংলা দেশে আমাদের চূড়ান্ত নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলতে হয়, কারণ আমরা বেশী খরচা করতে পারি না। আমাদের ছবির জগৎও সীমাবদ্ধ।

ওয়াজদা : কিন্তু আপনি কি কখনো জনপ্রিয় তারকাদের ব্যবহার করেন নি ?



ওয়াজদার সঙ্গে
সত্যজিৎ রায়

রায়: আমি সবচেয়ে খ্যাতনামাদের ব্যবহার করি নি, কিন্তু আমার আবিষ্কৃত একজন অভিনেতা এখন খুব নামকরা অভিনেতা হয়ে গেছে, সে এখনও আমার ছবি করে। আর একজন অভিনেত্রী, যাকে আমি আবিষ্কার করেছিলাম সে-ও এখন বোম্বে গিয়ে প্রচণ্ড নাম করেছে। তবে এরা খ্যাতনামা হয়ে পড়লে ওদের ম্যানারিজম সম্পর্কে আমার আতঙ্ক হয়।

ওয়াজদা: আমি কি আপনাকে রিহার্সাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারি? আমার এ ব্যাপারে বিশেষ পদ্ধতি আছে। প্রথমত যাঁরা অনভিজ্ঞ অভিনেতা, আমি তাঁদের দিয়ে খুব একটা রিহার্সাল করাই না, আমার যেটা দরকার সেটা হল—

রায়: তাদের তাজা ভাব—

ওয়াজদা: কিন্তু অনভিজ্ঞ অভিনেতাদের দিয়ে রিহার্সাল করানো উচিত। কারণ যাঁরা তরুণ, তাঁরা ছবির কলাকৌশলের দিক বুঝতে পারেন না এবং তাঁদের মধ্য থেকে ভাল অভিনয় পাওয়া মুশকিল।

রায়: আপনি কি আমার সঙ্গে একমত, আমি যেমন ঠিক মত সাজ-সজ্জা না হলে সেটে রিহার্সাল করাতে পারি না; কোন উৎসাহ পাই না—

ওয়াজদা: এই ধরনের রিহার্সাল, যদি একে রিহার্সাল বলেন, প্রথম দিকে খুবই প্রয়োজনীয় মনে হয়।

রায়: হ্যাঁ।

ওয়াজদা: চরিত্রকে বিশেষ রেখাটি ধরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে রিহার্সাল দরকার। কিন্তু আবার এই রিহার্সালও অপ্রয়োজনীয়, যতক্ষণ না ছবিটি ডায়লগপ্রধান হয়।

রায়: হ্যাঁ। বিশেষত আপনি যখন ভাবছেন যে লম্বা লম্বা সটে শুটিং করবেন, যখন অভিনেতাদের বিশেষ মুহূর্ত ধরে রাখতে হচ্ছে, তখন এটা একটা সমস্যা হতে পারে।

ওয়াজদা: হ্যাঁ, কিন্তু যতক্ষণ না অভিনেতারা নিজেদের পোশাক পরিহিত নয় এবং যে জায়গায় শুটিং হবে, তখন তারা পরিচালকদের কাছে মৃত …(হাস্য)

রায়: ঠিকই বলেছেন, আমার ক্ষেত্রেও এটা ঠিক। সেইজন্যেই প্রশ্ন করেছিলাম।

ওয়াজদা: দেখুন সেটে সবকিছু যাতে থাকে, তার দিকে নজর রাখা উচিত।

রায়: ঠিকই বলেছেন। আচ্ছা, আপনি কি এ ব্যাপারে একমত যে, আন্তোনিওনি যখন বলেন, অভিনেতা পরিচালকের হাতে পুতুল, যে অভিনেতাকে যা করতে বলা হবে তাই করবে, তার নিজের বলতে কিছুই করবার নেই!

ওয়াজদা: আমি এর তীব্র বিরোধিতা করছি।

রায়: আচ্ছা। কিন্তু কথাটা আন্তোনিওনি বলেছেন।

ওয়াজদা: হ্যাঁ, তা তো বটেই।

রায়: আমি মনে করি উনি ঠিক বলেন নি।

ওয়াজদা: (হাসতে হাসতে) হয়ত আন্তোনিওনি একথা মনে করেন কারণ প্রধান অভিনেত্রী তাঁর স্ত্রী। আমি মনে করি অভিনেতাদের পুতুল বলার অর্থ হল স্টার প্রথাকে আহত করা।

নেপথ্যে নিঃসঙ্গ নায়ক

ডেভিড জে ম্যাককাচ্চন

[ইংলণ্ডের কভেনট্রিতে এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে ডেভিড, জে, ম্যাককাচ্চনের জন্ম হয়, ১৯৩০ খ্রীঃ। বিগত ১২ই জানুয়ারি '৭২ আকস্মিক মারাত্মক পোলিও রোগের আক্রমণে কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ডেভিড প্রথম ভারতে আসেন ১৯৫৭ খ্রীঃ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হয়ে, তারপর ১৯৬০ খ্রীঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক ও পরবর্তীকালে রীডার পদে উন্নীত হন। তিনি বোধহয় এ-শতাব্দীর অন্যতম ভারত-পথিক। বাংলার মন্দিরশিল্প ও পুরাকীর্তি ছিলো তাঁর নিবিড় গবেষণার বিষয়। বাংলার গ্রাম গ্রামান্তর ঘুরে লুপ্ত 'টেরাকোটা' শিল্পের তথ্য সংগ্রহ করে বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ লিখেছেন। চিত্র-পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে ছিলো তাঁর গভীর সখ্যতা। তিনি বাংলা চলচ্চিত্রের প্রতি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। 'নায়ক'-এর সম্পূর্ণ চিত্রনাট্যটি তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন, বিদেশী দর্শকদের জন্যে ঐ ছবির মনোজ্ঞ ইংরেজী সাব-টাইটেলও রচনা করে দিয়েছেন। 'নায়ক'-এর ওপর তাঁর একটি স্বতন্ত্র আলোচনার ভাবানুবাদ এখানে প্রকাশিত হলো]

আজ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সত্যজিৎ রায়ের একটা বৈশিষ্ট্য খুব স্পষ্ট হয়ে উঠছে, তা হলো তাঁর সাধারণ বিষয় নিয়ে অসাধারণ ছবি করার নৈপুণ্য। যৌন মনস্তত্ত্ব কিংবা কোন বিকৃত বিচ্ছিন্নতা-বোধ না এনেও কত গভীর ছবি হতে পারে তা 'নায়ক' না দেখলে বিশ্বাস হয় না। যুগের যন্ত্রণা অথবা প্রচণ্ড বিক্ষোভ এ ছবিতে আছে, কিন্তু কোন হালকা চাল নেই। সত্যজিৎ রায় এ্যান্টি রোমান্টিক। কিন্তু 'নায়ক' দেখলে আপাতভাবে মনে হয় এটা একটা রোমান্টিক ছবি, তা মোটে নয়। মামুলি ছবিতে নায়ক-নায়িকার প্রেম বিরহের মতো এত ভরতর করে এ ছবি পরিণতির দিকে অগ্রসর হয় না। 'নায়ক' ছবিতে আছে জীবন-যন্ত্রণার অন্ধকার, নিঃসঙ্গ ফল্গুস্রোত।

জনপ্রিয় চিত্রাভিনেতা অরিন্দম মুখার্জি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার আনতে দিল্লি যাচ্ছে। ট্রেনের সহযাত্রী ও সহযাত্রিনী কয়েকটি চরিত্র এবং তাদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারকে কেন্দ্র করে 'নায়ক' এক চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগিয়েছে।

মিস সেনগুপ্ত একটি আধুনিক বিদগ্ধ মহিলা পত্রিকার প্রতিনিধি। অরিন্দমের সঙ্গে ট্রেনের কামরায় এক সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর পত্রিকার জন্যে অরিন্দম সম্পর্কে কিছু জানতে চান। যদিও মিস সেনগুপ্ত অরিন্দমের অন্ধভক্ত নন। কিন্তু এই কামরায় অরিন্দমের ভক্ত আছেন এক পরিবারের মা ও মেয়ে। আর আছেন একজন সাধাসিধে ভালো মানুষ, যিনি স্পষ্ট বলে বসেন অরিন্দমকে যে তিনি সিনেমা দেখেন না, যেহেতু তা অবাস্তব।

মিস সেনগুপ্তের আবির্ভাবে যেটুকু রোমান্সের সৃষ্টি হয় তার যেন কিছুটা মেঘ কেটে যায়। অরিন্দমের মদ্যপান, রাতের ট্রেন, সহযাত্রী সহযাত্রিনীর নানা কৌতূহল। কিন্তু অরিন্দমের নিঃসঙ্গতা যেন জ মা ট বাঁধে। অরিন্দম জীবনের সাফল্যের মুহূর্তে নিঃসঙ্গ একা। পরের দিন সকালের প্রাতঃরাশ সময় আবার দেখা হয় মহিলা কাগজের প্রতিনিধির সঙ্গে। এমনিভাবে ছবি যখন এগিয়ে যাচ্ছে ঠিক তখন মনে হয়



যেন সব বিষয়টির পরিকল্পিত একটা নিজস্ব ধরন আছে। 'নায়ক' ছবি যেন 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র মতো এক অনাটকীয় বিষয়বস্তুতে এক বিপরীত লক্ষ্যের ছবি। পরস্পর বিরোধী বিপরীতধর্মী চরিত্রের ভিড়ের মধ্যে বৈপরীত্য যেন খুব বড়ো হয়ে উঠছে মনে হয়। পরিকল্পিত বিষয় বলে মনে হলেও বক্তব্যে গভীর ছবি 'নায়ক'। উপকাহিনী হিসাবে দেখানো হয়েছে ট্রেনের কামরায় শিল্পপতির দাম্পত্য-জীবনের নোংরা দিক। যেখানে স্ত্রী নিয়ে 'বেট' ধরতেও শিল্পপতি প্রস্তুত।

আদর্শবাদী অঘোর চ্যাটার্জির মুখে আমাদের যুগের অবক্ষয়ের কথা, তাঁকে কৌতুক চরিত্র করে তোলে। এছবির মধ্যে চমকপ্রদ ব্যাপার হলো বিপরীত বিষয় বৈচিত্র্য। যেমন রোমান্স, বাস্তবতা, সায়ল্য, অভিজ্ঞতা, সততা, হতাশা এবং বিবেকবোধ প্রভৃতি। এই বিপরীতধর্মী চরিত্রগুলো ক্যামেরার চোখে একের পর এক আবির্ভূত হয় এবং সরে যায়। তাদের কথা ও কাজে এক একটা বিশেষ দাগ রেখে যায় মনে।

চ্যাটার্জি-কন্যা অসুস্থ বুলবুল শয্যাশায়ী, কিন্তু তার প্রিয় চিত্র-অভিনেতা অরিন্দম মুখার্জির আবির্ভাবে যেন জাদু-মন্ত্রের মতো সুস্থ হয়ে ওঠে। বুলবুলের মা-ও অরিন্দমের ভক্ত। ট্রেনের কামরার করিডরে একটি শিশুর সঙ্গে অরিন্দমের সখ্যতা গড়ে ওঠে। এমন বহু ঘটনা পরম্পরা ছবির মধ্যে আছে, যাতে মনে হয় পরিচালক এক বক্তব্যের গভীরে নিয়ে যেতে চান নায়ককে। যাত্রা শেষে অটোগ্রাফের জন্যে মিস সেনগুপ্ত খাতা বাড়িয়ে দেন। মিস সেনগুপ্তের কিছু প্রশ্ন আবার অরিন্দমকে বিব্রত করে। জীবনের নিঃসঙ্গতা ও নিহিত ব্যর্থতা অস্থির করে তোলে অরিন্দমকে। এদিকে আছে কট্টর রাজনৈতিক কর্মী একদা বন্ধু বীরেশের সঙ্গে অরিন্দমের সম্পর্কের চাতুরী। চতুষ্পার্শ্বের শূন্যতা বিচ্ছিন্ন করেছে অরিন্দমকে জীবনের স্বাভাবিক সম্পর্ক থেকে। অরিন্দম ও মিস সেনগুপ্তর মধ্যে অনেক অন্তরঙ্গ কথোপকথন হয়। অরিন্দম জিজ্ঞাসা করে এই যাত্রার স্মৃতি নিয়ে মিস সেনগুপ্ত কিছু লিখবেন কি না। ছোট্ট উত্তরে মিস সেনগুপ্তের কথা শেষ হয়।

চলচ্চিত্র জগতের অবাস্তব অলীক মায়ায় জীবন নিয়ে এক বাস্তব ছবি হলো 'নায়ক'।

নায়কের জীবনে খ্যাতি ও জন-প্রিয়তার অন্তরালে যে একাকীত্ব, সত্যজিৎ তাকে অসম্ভব শিল্পনিষ্ঠায় তুলে ধরেছেন, খুব নিটোল ঘটনা বিন্যাসে। নায়কের ভূমিকায় উত্তম-কুমারের অভিনয় এত বাস্তব ও স্বাভাবিক যে অভিনয় বলে মনে হয় না।

সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক' নেপথ্যে নিঃসঙ্গ ; ভিড়ের মধ্যে একা ; নিতান্তই বাস্তবতাবাদী ছবি।

আমাদের সমস্যা

সত্যজিৎ রায়

ইদানীংকালের বিদেশী ছায়াছবিতে যে জিনিসটা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সেটা হোলো চিত্র ভাষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি অক্লান্ত প্রয়াস। আধুনিক ইতালীয়, ফরাসী, পোলিশ, জার্মান, মার্কিন, বৃটিশ—সব জাতীয় ছবিতেই এটার ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে।

এর একটা কারণ অবশ্য এই যে এইসব দেশের দর্শক চিত্রশিল্পের সমঝদার হিসেবে অনেকটা পরিণত হয়ে উঠেছে, ফলে পরিচালক এই ধরনের পরীক্ষায় ব্রতী হবার সাহস পেয়েছেন। কিন্তু এছাড়া এর আরো একটি কারণ আছে। সেটা হোলো যুদ্ধোত্তর যুগে চিত্রনির্মাণ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় যন্ত্রাদির ব্যাপক উন্নতিসাধন ও নানান নতুন যন্ত্রের আবিষ্কার। যন্ত্রই যখন সিনেমা শিল্পের জন্মদাতা, তখন যন্ত্রের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে সিনেমার ভাষার যে একটা রূপান্তর ঘটবে সে তো স্বাভাবিক।

অবিশ্যি এখানে বলা দরকার যে চলচ্চিত্রের আদিযুগেও নেহাতই প্রাথমিক যন্ত্রপাতির সাহায্যেই এমন সব চিত্র রচিত হয়েছে, শিল্পের বিচারে তার তুলনা আজও মেলা ভার।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রচিত ফ্লেহার্টির 'নানুক অফ দ্য নর্থ' বা চ্যাপলিনের যে কোনো দুটি রীলের কমেডি ছবি দেখলেই এর সত্যতা উপলব্ধি করা যায়।

কিন্তু এও অনস্বীকার্য যে, নানান নতুন যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে আজ চিত্র পরিচালকরা যে-সব জটিল বিষয়-বস্তুর চিত্ররূপ দেওয়ার স্পর্ধা করতে পারেন, আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে কোনো পরিচালকের পক্ষে তা সম্ভব ছিলো না।

এসব যন্ত্রের মধ্যে আছে বিভিন্ন রকমের লেন্স, বিভিন্ন জাতের ফিল্ম, ক্যামেরাকে যথেচ্ছ চালানোর জন্যে বিভিন্ন শ্রেণীর যানবাহন, ট্রলি, ক্রেন ইত্যাদি। আজকের দিনে সিনেমা পরিচালককে যান্ত্রিক কৌশলের অভাবে কল্পনাকে সীমাবদ্ধ রাখার কোনো বাধ্য বাধকতা নেই। বিশেষ করে হলিউডে বেশ কিছুকাল থেকেই কলা-কুশলীরা বড়াই করে এসেছে যে, পরিচালক এমন কিছু ভেবে বার করতে পারেন না যা তাঁদের পক্ষে পর্দায় রূপান্তরিত করা সম্ভব নয়।

বলাই বাহুল্য একমাত্র শিল্পীর পক্ষে সম্ভব এই সমস্ত নবাবিষ্কৃত যন্ত্রপাতিকে শিল্পসম্মত করে কাজে লাগানো। আধুনিক অনেক বিদেশী ছবি দেখেই মনে হয়েছে যে, যন্ত্রের মোহ পরিচালককে এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে ছবির জন্যে অন্য দিক অগ্রাহ্য করে তিনি যেন তাঁর সমস্ত চিন্তা, শ্রম এবং অর্থ কেবল যন্ত্রের ভেল্কিতেই প্রয়োগ করেছেন। প্রকৃত শিল্পীই জানেন কিভাবে মাত্রা রেখে সংযমের সঙ্গে এইসব যন্ত্রের সদ্ব্যবহার করা সম্ভব।

আমরা, যারা বাংলাদেশে কাজ করি, তারা এইসব অধুনা-আবিষ্কৃত আলো, লেন্স, ফিল্ম ইত্যাদি ব্যবহার করার সামান্যই সুযোগ পাই।

ফলে আমাদের কাছে এখনো অনেক বিষয়বস্তুই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। সত্যি বলতে কি, যে সব যন্ত্রপাতি আমাদের আছে এবং যে সব নিয়ে আমরা সব সময়েই কাজ করি, তার দমে চিত্ররচনা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

যন্ত্রপাতির এই দৈন্য দূর না হলে বাংলা ছবির উৎকর্ষ শুধুমাত্র একটি সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকবে এবং এই গণ্ডির বাইরে বিচরণের স্পর্ধা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এই দৈন্য দূর না হলে অনেক কাহিনী, অনেক ভাব, অনেক রস চলচ্চিত্রে ব্যক্ত হতে পারবে না। বা হলেও এমনভাবে হবে, যার চেয়ে না হওয়াই ভালো।

গভীর মানবিকতা

পল গ্রিন

অর্থনীতির একজন প্রতিভাদীপ্ত ছাত্র একদিন কলকাতার এক জনাকীর্ণ প্রেক্ষাগৃহে বাংলা ছায়াছবির দৈন্য, হুল্লোড়, হতাশার আর প্যানপ্যানানির মধ্যে দাঁড়িয়ে ভালো ছবি করার প্রয়োজন অনুভব করেন। নিজেকে পড়াশুনার মধ্যে দিয়ে তৈরী করে নেবার নিঃশব্দ অঙ্গীকার নেন। তার পাঁচ বছর পর বিশ্ববাসী দেখতে পেল তাঁর সৃষ্টিকে। ভারতীয় চলচ্চিত্রের সমৃদ্ধ ফসল, এমন কি পশ্চিমের চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা পর্যন্ত অবাক হলো ভারতীয় চলচ্চিত্রের এ সাফল্য দেখে।

এখন মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়সে শ্রীরায় প্রযোজক, পরিচালক, লেখক ও প্রচারক। তাঁর অপুর ট্রিলজি তাঁকে জগৎ বিখ্যাত করেছে।' আন্তর্জাতিক শ্রেষ্ঠ পুরস্কারে তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন। এই ছবি তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রে খুবই জনপ্রিয় করেছে। 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' ও 'অপুর সংসার' সবগুলো তাঁর সফল ছবি। এবং শীঘ্রই 'অপুর সংসার' ন্যুয়র্কে প্রদর্শিত হবে। এ ছবিগুলোতে আমেরিকান দর্শক পেলো আনন্দ ও বেদনায় নিটোল ভারতীয় সামাজিক জীবনের আলেখ্য। শুধু তাই নয়, তাঁরা আরো দেখলেন, চিরাচরিত হলিউড প্রথায় নাচ, গান, হল্লা আর খ্যাতনামা চিত্রতারকা ছাড়া কত ভালো ছবি করা যায় তার নিদর্শন।

সত্যজিৎ রায় তাঁর গভীর মানবিকবোধ ও সততা নিয়ে ছবি পশ্চিমের 'মরবিড' ও খেলো 'সেনটিমেন্টাল' ছবিকে ম্লান করে দিয়েছেন।

শ্রীরায় ভারতীয় চলচ্চিত্রে এক নতুন যুগের স্রষ্টা। ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ, যেখানে দৈনন্দিন জীবনযাপনে ব্যর্থতার গ্লানি অসহনীয়। চলচ্চিত্র বলতে হিন্দি ছবির উদ্ভট, আজগুবি ব্যাপার-স্যাপার; কিংবা পৌরাণিক উপাখ্যান। তাছাড়া মামুলি দরিদ্র যুবকের ধনী তনয়ার সঙ্গে প্রেমের ঘটনা। রমরমে নাচগানের ছবির মধ্যে সত্যজিৎ যেন এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রম।

ভারতীয় মামুলি ছবিতে শিল্পকর্ম বড়ো কথা নয়, সেখানে বিচার্য হলো জনপ্রিয় চিত্রতারকা।

অবশ্য ভারতবর্ষ চলচ্চিত্র-শিল্প হিসাবে হলিউড থেকে প্রায় তিরিশ বছর পেছনে পড়ে আছে। সেই জন্যে 'পথের পাঁচালী'র আগে কোন ভারতীয় চলচ্চিত্র পশ্চিমে এতটা অভিনন্দিত হয় নি। ভারতবর্ষ সত্যজিৎ রায়ের জন্যে বোধহয় প্রস্তুত ছিলো না। তাঁর আন্তর্জাতিক সম্মান সবাইকে তাই এত বিস্মিত করেছে।

কলকাতায় এমন এক পরিবারের শ্রীরায়ের জন্ম যার সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক একটা ঐতিহ্য আছে। শিল্পানুরাগ তাই তাঁর প্রায় সহজাত ব্যাপার। খুব ছোটবেলা থেকে শিল্পের আকর্ষণ তাঁর ছিল, কিন্তু চলচ্চিত্র তাঁর 'প্যাশান' বললে বেশী বলা হবে না। চলচ্চিত্র সম্পর্কিত বহু তথ্য তিনি যেমন পড়েছেন, তেমনি দেখেছেন গভীর মনোযোগের সঙ্গে হলিউডের বহু চিত্রনির্মাতার ছবি। যেমন জন ফোর্ড, উইলিয়াম ওয়াইলার, ফ্রাঙ্ক কাপরা, জন হাস্টন এবং বিলি ওয়াইলডার প্রভৃতির ছবি তিনি বহুবার দেখেছেন। অবশ্য এসব তিনি দেখেছেন ফিল্ম সোসাইটির বিশেষ প্রদর্শনীতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ, কলকাতার ফিল্ম সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় শ্রীরায়ের যথেষ্ট সহযোগিতা ছিলো।

সত্যজিৎ রায় বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন জাঁ রেনোয়ার 'দি সাউদার্নার'র আর রবার্ট ফ্লেহার্টির 'নানুক অফ দ্য নর্থ' এবং চ্যাপলিনের প্রায় সমস্ত ছবি থেকেই।

১৯৫০ সালে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে কলকাতায় জাঁ রেনোয়ার সাক্ষাৎ হয়। রেনোয়া সে সময় কলকাতা তাঁর 'দি রিভার'-এর চিত্রগ্রহণের জন্যে এসেছিলেন।' এর কিছুদিন পরে শ্রীরায়

তাঁর বিজ্ঞাপন সংস্থার কাজে লণ্ডন অফিসে চলে যান। লণ্ডনে থাকাকালীন তিনি বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা পান ভিট্টোরিও ডি সিকা'র ছবি 'বাই-সাইকেল থিফ' দেখে।

লণ্ডন থেকে ভারতে ফেরার সময় শ্রীরায় বাংলা ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'র চিত্রনাট্যে হাত দেন। এ ছবি করার পেছনে সত্যজিৎ রায়ের এক বিশুদ্ধ শিল্পভাবনা ছিল, যার আবেদন সর্বজনীন।

অবশ্য এ ছবি তুলতে শ্রীরায়কে প্রায় সর্বস্বান্ত হতে হয়েছিল, তাঁর মূল্যবান বই, অলঙ্কার, ফোনোগ্রাফ রেকর্ড সব বিক্রি করে দিতে হয়। একমাত্র রবিবার আর ছুটির দিন ছাড়া ছবির কাজ তিনি তখন করতে পারতেন না, কারণ তখন বিজ্ঞাপন সংস্থার চাকুরি করে ছবি তুলতে হতো। মাস দুয়েকের মধ্যে সঞ্চিত অর্থ প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল। এই সঙ্কটে তিনি ভেঙে না পড়ে নতুন উদ্যমে সরকারী সাহায্যে চেষ্টা করে বহু আশা-নিরাশার মধ্যে দিয়ে ছবি শেষ করলেন। যা হোক, এসব কথা আজ প্রায় অনেক চিত্রামোদী জানেন। নতুন করে কিছু বলতে গেলে তার নিজের বক্তব্যই খুব বেশী করে মনে পড়ে—'চলচ্চিত্র নির্মাণে কোন গোঁড়ামি আমার নেই, গভীরভাবে কোন বিষয়ে আলোড়িত হলে তবেই আমি ছবি তুলতে পারি, যেহেতু এটা একটা সৃষ্টির খেলা।'

চলচ্চিত্রের বহু সমালোচক মনে করেন যে সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্রের নতুন যুগস্রষ্টা।

অমল বিন্যাসে ডিলিস পাওয়েল

ভারতীয় চলচ্চিত্র আজ আমাদের যে অভিনব এক চলচ্চিত্রের সন্ধান দিয়েছে তা সত্যি আশ্চর্যজনক। সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'তে যে অমল শৈশবের স্মৃতি চিত্রায়িত হয়েছে তা চলচ্চিত্রের মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। সাধারণ শৈশবের ছবির মধ্যে সমস্যা আছে। দুরন্ত শিশু, উপেক্ষিত শিশু, কিংবা হিংস্র শিশু। শিশুরা গৃহত্যাগ, এমন কি আত্মহত্যা পর্যন্ত করছে।

সত্যজিৎ রায় কিন্তু তাঁর 'পথের পাঁচালী'তে সমস্ত রকম দৈন্য, দারিদ্র্যের মধ্যে স্নেহ ও ভালোবাসার পরিবেশে শৈশবের উন্মেষ ঘটিয়েছেন।

এ কথাটা মোটেই ঠিক নয় যে প্রাচ্য চলচ্চিত্র মানেই খালি পায়ে বন বাদাড়ের মধ্যে দিয়ে ছেলে-মেয়েরা ছুটে যাচ্ছে। 'পথের পাঁচালী'তে গ্রামবাংলার এক অস্বচ্ছল পরিবারের কঠোর জীবন সংগ্রাম। একটি শৈশবের বিকাশ।

অলস বেকার বাবা, আরেক দিকে সংসারের জন্যে মায়ের হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি। বৃদ্ধা ইন্দির ঠাকরুণের ওপর অপু দুর্গার স্নেহের অত্যাচার; মৌল এমন কয়েকটি চরিত্রকে নিয়ে অপুর বৃহত্তর সংসার ও মানব জীবনের গভীর রহস্যের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে। বৃদ্ধা ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে অপু ও দুর্গারও এক বিস্ময়বিমূঢ় পরিচয় হচ্ছে নতুন এক জগতের সঙ্গে, যেখানে মৃত্যু আগন্তুক নয়, মৃত্যু অনিবার্য। দু'টি ছেলেমেয়ের চোখের সামনে অবারিত হয়েছে অন্তর্ভুবন; যদিও সত্যজিৎ রায়ের ট্রিলজির এটা প্রথম ছবি; কিন্তু আমি এই ছবি দ্বিতীয়বার দেখি (কান ফিল্ম) চলচ্চিত্র উৎসবে।

কথাটা খুব আশ্চর্য শোনাবে, কিন্তু এটা ঘটনা যে 'পথের পাঁচালী' লণ্ডন ফিল্ম এ্যাকাডেমিতে দেখতে গিয়ে বই শেষ হবার পর দেখলাম দর্শক হতবাক হয়ে গেছে। পশ্চিমের অপরাধমূলক শিশুচলচ্চিত্রের জগতে এটা বিস্ময়কর ব্যাপার। কয়েক বছর আগে 'দি কিলিং', একটা অপরাধমূলক চলচ্চিত্র গ্যাংগস্টারদের নিয়ে তোলা হয়েছিলো। দেখানো হয়েছিলো যুদ্ধের বিভীষিকা আর অত্যাচারের মধ্যে দিয়ে কিভাবে মানবিকতার অপমৃত্যু ঘটছে। সত্যজিৎ রায় গভীর শিল্পী সত্তার অধিকারী। তাঁর শিল্পসৃষ্টি দেখে প্রাচ্যের শৈশবের এমন অমল বিন্যাসে সত্যি হতবাক হতে হয়।

অপূর্ব ছবি ভিন্নরুচি

—আর্চার উইনস্টন—

নিউ ইয়র্ক পোস্ট-এর এই বিভাগে পর পর তিনটি সোমবার 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' নিয়ে আলোচনা করেছি, তবু আর একবার সেই পুরনো আলোচনায় ফিরতে হল, কেননা, আমি লক্ষ্য করেছি, এই অপূর্ব চিত্র-অভিজ্ঞতার সঙ্গে এক ধরনের বিভ্রান্ত অবিচারও যুক্ত হয়ে আছে।

যাঁরা উপরোক্ত দুটি ছবির একটিও দেখেন নি তাঁরা দেখলে বাংলা ও বাঙালীর জীবন ও জগতে প্রবেশের একটি সুলভ সুযোগ পেতে পারেন। আর যাঁরা দেখেছেন তাঁরা আর একবার দেখলে অধিকতর লাভবান হবেন। এ হচ্ছে সেই জাতের ছবি, সঙ্গীত বা কাব্যের মত, যা বার বার আস্বাদ করলে নতুন নতুন অর্থ প্রতিভাত হয়, উন্মোচিত হয় নব নব দিগন্ত। সত্যজিৎ রায়ের চিত্রকর্ম রুদ্ধশ্বাস সাসপেন্স বা উত্তেজক ক্রাইম ছবি নয় যে একবার দেখলেই তার আকর্ষণ ফুরিয়ে যাবে।

যে বিভ্রান্ত অবিচারের কথা বলছিলাম তা হল এই যে, ভারতীয় ঐ চলচ্চিত্র এদেশে আমাকেই একমাত্র উকিল পেয়েছে সংশ্লিষ্ট মহলে এমন একটা ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে। আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি ডেল রবিন্স-এর অবিবেচক পক্ষপাতদুষ্ট চিত্র-সমালোচনা নিয়ে যে বিতর্ক হয়েছে তাতে অনেকেই অনেক ভুল করেছেন, তা নিয়ে আমি বিশেষ কিছু বলতে চাই না। ব্যক্তিগত রুচির ওপর কথা চলে না, ভুল করার স্বাধীনতা সবাই-কার আছে, যেমন আছে মহৎ শিল্পের অপব্যাখ্যা ও হাস্যকর অর্থোদ্ধার করার অধিকার। সৌভাগ্যের কথা, 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' চিত্র দু'খানির শুধুমাত্র আমি একাই গুণমুগ্ধ অনুরাগী নই, অজস্র চিঠিপত্র আমার হস্তগত হয়েছে, সেসবের অনেক লেখকই আমার মতে মত দিয়েছেন। অনেক পত্রলেখক সবিস্তারে সুনিপুণভাবে সত্যজিৎ রায়ের প্রদর্শিত চিত্র দুটির উপযুক্ত মূল্যায়ন করেছেন। চিঠিগুলি এমনই সুলিখিত ও মর্মস্পর্শী যে প্রাপ্তিমাত্রেই আমার মনে হয়েছে আমি ওরকম লিখতে পারলে গৌরব বোধ করতাম।

প্যাট্রিসিয়া কে ব্রুকস লিখেছেন: আপনাদের বিভাগে প্রকাশিত ডেল রবিন্স-এর মন্তব্য আমাকে বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ করেছে। আমি 'পথের পাঁচালী' দেখেছি ও সত্যি সত্যি অভিভূত হয়েছি। ছবিটিকে কখনও আমার মন্থর মনে হয় নি, বরং এ ছবিতে গাছ-গাছালি, নদীনালা, কুকুর-পাখি, রোদ-বৃষ্টি, এক কথায় প্রকৃতিকে যেভাবে পরিবর্তিত সময় ও ঋতুর ব্যঞ্জনার্থে নীরব সঙ্গীতের মত ব্যবহার করা হয়েছে তা অনবদ্য শিল্পপ্রতিভার ফসল।

জেমস স্টলার লিখেছেন: শ্রীরায়ের ছবি অনাস্বাদিতপূর্ব অভিজ্ঞতা। 'অপরাজিত' যাঁদের আশাহত করেছে, এ ছবিকে যাঁরা নিরুৎসাহব্যঞ্জক বলছেন তাঁদের বলবেন, এতাবৎকাল আনন্দ বলতে যেমস্ত উল্লাসকে চলচ্চিত্রে দেখান হয়েছে 'অপরাজিত'র আনন্দ সে জাতের নয়; এ আনন্দ গভীর, স্নিগ্ধ, অচঞ্চল।

সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' আর 'অপরাজিত' আমরা আগেই দেখেছি, কিন্তু সম্প্রতি ফিফথ এভিন্যুতে 'অপুর জগৎ' দেখে অভিভূত হয়েছি। তুলনামূলকভাবে কোন খণ্ডটি ভাল তা বিচার না করাই ভাল। কারণ প্রতিটি খণ্ড নিজস্ব কাব্যিক সুষমায় সুন্দর। যদি প্রথম খণ্ডে গ্রাম্যজীবনের পটভূমিকায় একটি ছোট পরিবারের সংগ্রামের কথা জানতে পারি তা হলে দ্বিতীয় খণ্ডে বালকটির কৈশোরে উত্তরণ, তার শিক্ষা ও একক সংগ্রাম আর তৃতীয় খণ্ড হল সেই যুবকের বিয়ের কথা, দুঃখ, তার জীবন সংগ্রাম বলা হয়েছে। অনেকের কাছে 'পথের পাঁচালী' প্রিয়। কারণ ছবিটির সরলতা, কাব্যিক ছন্দ সকলের হৃদয় হরণ করেছে। আবার কেউ কেউ বলেন যে 'অপরাজিত' ছবিতে অপুর জীবনের দুঃখের দিক এত সুন্দরভাবে ফুটে

উঠেছে বলে শ্রেষ্ঠ। এই ছবিটিতেই আমরা দেখি মা ও ছেলের মধ্যে সুতোর মতো যে সম্পর্ক ঝুলছিল তা ছিন্ন হয়ে গেছে। আবার তৃতীয় দল আছেন, যাঁরা বলবেন অপুর জগতে আমরা প্রেম ও বিবাহোত্তর জীবনের মধুর সম্পর্ক জানতে পারি। এর আগে আর কোন ছবিতে প্রেমের এই গাঢ় সম্পর্ক দেখি নি।

অপুর জগৎ ভারতীয় বাস্তবতার চূড়ান্ত স্বাক্ষর। এই ছবিতে অনেক কিছু বলা হয়েছে। এক ক্ষতবিক্ষত শিল্পী, যিনি গড্ডালিকা প্র বা হে ভাসতে চান না; আজীবন সংগ্রামরত। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সত্যজিৎ রায় নিজের যশ সম্পর্কে সচেতন নন, তাই তিনি এত সহজে ছবির খুঁটিনাটি সম্পর্কে সজাগ। এই কারণে তাঁর ছবি একই সঙ্গে শিক্ষামূলক, আবার অপরদিকে বুদ্ধিদীপ্ত।

অপুর জগৎ শিল্পের জয়যাত্রার সাফল্য অর্জন করিয়েছে। নিজের প্রতিভা সমন্বিত দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীরায় বিভিন্ন চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন। অপুর চেহারা যেন পটে আঁকা কৃষ্ণর মত, (শাশুড়ির কথায়) আমাদের কাছে এই চরিত্র যেন ভারতীয় যৌবনের প্রতীক। অপুর অন্ধকার ঘর, ছেঁড়া ময়লা জামা-কাপড় সবকিছু মিলিয়ে একজন শিল্পীর পারিপার্শ্বিকতা ফুটে উঠেছে।

আমরা যত গভীরভাবেই মন দিয়ে ছবি দেখি না কেন, যেমন ভাবেই ছবির কাব্যিকগুণ বিচার করি, কোন খুঁত ধরা পড়বে না। একথা সত্য যে 'অপুর জগৎ'-এ মানবজীবনের অত্যন্ত সরল একটি দিক তুলে ধরেছেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়। আনন্দের কথা ছবিটার কোন বয়ঃসীমা নেই। এমন ছবি দেখতে দেখতে স্বভাবতই আমাদের মন নিটোল আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠে।

ওফেলিয়া: দেবী

এডওয়ার্ড হ্যারিসন

সত্যজিৎ রায় ভারতবর্ষের প্রথম পরিচালক, যিনি পৃথিবীর সবার জন্যে ছবি করেছেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতি পাওয়া অপুর ট্রিলজি তথাকথিত ভারতীয় চলচ্চিত্র থেকে এত আলাদা যে শুনেছি ভারতীয় কর্তৃপক্ষ নাকি সত্যজিতকে মোটেই সুনজরে দেখেন নি। ট্র্যাডিসন ব্যাপারটা অবশ্য কোনদিনই ভারতে পরিহাসের ব্যাপার নয়।

'দেবী' ছবি সত্যজিতের চতুর্থ ছবি। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর দয়ায় আমরা এদেশে ছবিটি দেখতে পাচ্ছি। ভারতীয় সেন্সর ছবিটির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলো, ওনাদের ধারণা ছবিটিতে হিন্দুধর্মকে বিকৃতভাবে করে দেখানো হয়েছে।

ছবিটি দেখার পর মনে হয়েছে অত্যন্ত বিষণ্ণ ও করুণ এই ছবিটির মধ্যে সত্যজিৎ যা সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে ভারতীয় ক্ল্যাসিক নৃত্যের আবেদন ও সৌন্দর্যের প্রতিবিম্ব আছে: এক মুহূর্তে পলাতক, অন্য মুহূর্তে স্থির।

দ্রুতগতিসম্পন্ন গল্পে অভ্যস্ত মার্কিন দর্শকের পক্ষে হয়তো এই গল্পের স্থিরতা ভালো নাও লাগতে পারে, কিন্তু তবু তাদের বসে থাকতে হবে সম্মোহিতের মতো। হিন্দু জীবন ও ধর্মের রহস্য ক্রমশ উন্মোচিত হবে সেই অবসরে।

মা কালীর বিভ্রান্ত মূর্তি থেকে ছবি যখন শুরু এবং শেষে নায়িকা যেখানে ওফেলিয়ার মতো সকালের কুয়াশার মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছেন—এই জায়গাটুকুর তুলনা কোথাও বোধ হয় পাওয়া যাবে না।

আঙ্গিকের দিক থেকে 'দেবী'র আঙ্গিক দু'রকম। এবং দুই আঙ্গিকের মধ্যে দুই পৃথিবীর সেতুবন্ধ হয়েছে। জীবন-দর্শনের দিক দিয়ে দেবী পশ্চিমী। ধর্মের জন্যে আত্মবঞ্চনার যে মানসিকতা এই ছবিতে ফুটে উঠেছে তার সঙ্গে কিছুটা মিল আছে 'দি মিরাকল' ও 'ডে অফ র‍্যাথ'-এর। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না।

অপুর প্রত্যাখ্যান

রবার্ট হকিন্স / প্যাট্রিসিয়া বেকার / পেনিলোপ জিলিয়াট

য়ুরোপিয়ান ফিল্ম-ফেস্টিভ্যালগুলি বহু বছর ধরে দেখার পর আজ আর তার কর্মকর্তাদের খেয়ালখুশির মহিমা দেখে অবাক হই না। এই বছরের ব্যাপারটা দেখুন, অনেক ভালো ভালো ও বাজে বাজে ছবি এসেছে অফিসিয়াল এন্ট্রি পাওয়ার জন্যে। 'বয় এণ্ড দ্য ব্রিজ' থেকে 'সোনাটাস'-এর উপাখ্যান অবধি এবারে যে ছবিগুলি এসেছে, সেগুলি কোনোমতেই দেখাবার মতো নয়, অথচ সেগুলোই দেখানো হচ্ছে।

এদিকে দেখুন, অপুর ট্রিলজিকে একেবারেই বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কমিটির বক্তব্য অনুসারে 'অপুর সংসার' আগে দেখানো অপু কাহিনীর মতই। ভাবুন, দু বছর আগে 'অপরাজিত' ভেনিসের গ্র্যাণ্ড প্রি পুরস্কার পেয়েছিলো! কমিটির এই একান্ত যুক্তিহীন সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট হোলো যখন গুটি কয়েক সাংবাদিক 'অপুর সংসার' দেখলেন শহরতলির এক ছবিঘরে। 'অপুর সংসার' প্রমাণ করেছে সত্যজিৎ যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পরিচালকদের অন্যতম। এ ছবি বিশ্ব মানবতা ও সৌন্দর্যের ছবি। (রবার্ট হকিন্স)

অপুর সংসারের সঙ্গে একমাত্র ডনস্কয়ের 'গর্কি' ট্রিলজির তুলনা হতে পারে। গর্কির শেষ খণ্ড প্রথম দুই খণ্ডের মতো উচ্চমানের নয়, কিন্তু অপুর ট্রিলজি সর্বাংশে উচ্চমানসম্পন্ন।

ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল সব চেয়ে সুন্দর ছবিটিকে বাদ দিয়েছে। লিডোর সিনেমা হলে ছবি দেখার পর মনে হয়েছে, এর চেয়ে মহৎ ছবি আর হয় নি। বিশ বছর আগে 'ম্যান অফ আরান'কে সোনালি সিংহ দেওয়ার পর ভেনিসের রুচি এত নেমে গেলো কেমন করে?

(প্যাট্রিসিয়া বেকার)

অত্যন্ত চমৎকার, দীর্ঘসূত্রে ট্রিলজি সত্যজিতের 'অপুর সংসার'। সমস্ত ছবিটা যেন লিরিকের মতো। ধীর স্থির কাব্যিক ছন্দ শাদা-কালোর মধ্যে আশ্চর্যভাবে ফুটে উঠেছে। সত্যজিতের স্টাইল ন্যাচারালিস্টিক। 'তোমার চোখে কি?' নায়ক জিজ্ঞেস করলো, তার প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য এক অনুভূতিতে মুগ্ধ হলুম আমরা।

(পেনিলোপ জিলিয়াট)

নির্বাক যুগের দুঃসাহস

চার্লস হিগাম

হোটেল অস্ট্রেলিয়ার একটি বিলাসবহুল কামরায় বসে আমরা কথা বলছিলাম। আন্তর্জাতিক চিত্রতারকারা সাধারণত যে হোটেলে ওঠেন, সত্যজিৎ রায় সেখানে যান নি। অগাধ বিস্ময়ে এই বিশাল প্রতিভার সামনে এসে আমি নীরব হয়ে গেছি। জাঁ রেনোয়া যাঁকে ভারতীয় চলচ্চিত্রের পিতৃতুল্য বলেছেন, গদার ও আন্তোনিওনির সমতুল্য পরিচালক বলেছেন সেই খ্যাত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে এল। সিডনী ফিল্ম ফেস্টিভালের জন্যে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত এই বিশ্ববন্দিত পরিচালক খুব নরম গলায় তাঁর বিগত চোদ্দ বছরের অভিজ্ঞতা বলছিলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট হয়ে তিনি অন্যান্য পরিচালকদের মত শিল্পী জীবনযাপন আরম্ভ করেন। তারপর ১৯৫৫ সাল অবধি তিনি বিজ্ঞাপন কোম্পানীতে কাজ করতেন। কাজের ফাঁকে রবিবারগুলোতে তিনি রেনোয়ার 'দি রিভারে'র স্যুটিং দেখতে যেতেন।

'পথের পাঁচালী'র গল্পটা ছিল একটি ছেলের ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠার কাহিনী নিয়ে। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল কাহিনীকে তিনি প্রয়োজন অনুযায়ী সাজিয়ে নিয়েছেন। ছবি আরম্ভ করার সময় থেকে তাঁকে প্রচুর দুঃখ সহ্য করতে হয়েছিল। তার মধ্যে অর্থের অভাবই ছিল নিদারুণ। এক স্টুডিও থেকে আর এক স্টুডিও হন্যে হয়ে ঘুরেছেন। লাইফ ইনসিওরেন্সের টাকা অবধি লগ্নী করেছিলেন, তবুও কেউ সাহায্য করেন নি। অবশেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এগিয়ে এসেছিলেন।

ছবি মুক্তি পাবার পর সবাইকার চমক লাগল, এর আগে পর্যন্ত ভারতীয় চলচ্চিত্র ছিল ন্যক্কারজনক। সঙ্গীত ছিল চড়া, আর মেলোড্রামায় ভরপুর অভিনয়। কিন্তু 'পথের পাঁচালী' বিশ্বের দরবারে পৌঁছল অদ্ভুত এক সৌন্দর্যে মথিত হয়ে। নানা ধরনের ঘরোয়া আলোচনায় শ্রীরায় বলছিলেন তাঁর নিজস্ব মতামত।

ভারতীয় ছবিতে চুম্বন দেখানো হয় নি। রায় বলছিলেন।

এমনকি সেই নির্বাক যুগেও কেউ সাহস পান নি। আমি 'দেবী' ছবিতে চুমু দেখিয়েছি। ওই বিশেষ দৃশ্যটির খুব দরকার ছিল। কারণ স্বামী স্ত্রী দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থাকার পর মিলিত হয়েছে, সুতরাং চুমু না থাকলে অবাস্তব



হয়ে যেত। অবশ্য 'দেবী'তে চুমু দেখিয়েছিলাম, অনেক দূর থেকে। মশারীর মধ্যে নায়ক নায়িকা চুমু খাচ্ছিল, তবে সবটাই ঝাপসা করতে হয়েছিল। যেখানে ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা এখনও কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সেখানে কি করে এর চেয়ে আধুনিক কোন পন্থায় চুমু দেখানো সম্ভব ?

ভবিষ্যতের জন্যে ঠিক করেছি, একটা ছবিতে ধর্ষণ দেখাবো, কিন্তু দু'রকমভাবে।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি কি ছবিতে কোন রাজনৈতিক বক্তব্য রাখতে পারেন ?

সেটা খুব শক্ত। যে ক্ষমতা শাসন করছে তার সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে ভাবা দরকার। আর বেশ বাঁকিয়ে-চুরিয়ে বলতে হবে। ধরা যাক, কোন ছবিতে রাজনৈতিক মহলের কারচুপি দেখাতে চাই, কিন্তু তখন আমাকে সমস্ত চরিত্রগুলো কাল্পনিক করে দেখাতে হবে।

আপনাকে কি কখনও এই ঝামেলা পোয়াতে হয়েছিল ?

নিশ্চয়। এমনকি 'দেবী'তেই আমাকে অনেক বিপত্তির মুখোমুখি হতে হয়েছে। যেহেতু কুসংস্কারকে ছবিতে আঘাত করেছিলাম, তাই অনেকেই বলেছিলেন হিন্দুধর্মের প্রতি আমার অনীহার কথা। পার্লামেন্টে কথা উঠেছিল আমার ছবি যেন বাইরে না যায়, কারণ আমি ভারতীয় ঐতিহ্যে আঘাত করেছি। তারপর অবশ্য নেহেরুর হস্তক্ষেপের ফলে সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল।

সত্যজিৎ রায়ের ছবি প্রায়ই ৭৫০০০ ডলারের মধ্যে তৈরী হয়ে যায়। তিনি নিজেই চিত্রনাট্য রচনা করেন, সঙ্গীত সৃষ্টি করেন, ক্যামেরা অবধি চালান। এছাড়া কলকাতার স্টুডিওতে যা অবস্থা, চারদিকে ইঁদুর, দেয়ালগুলো ফাটা, তার মধ্যে শুটিং করতে হবে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রিহার্সাল করে, ক্যামেরা মুভমেন্ট সম্পর্কে খুঁটি-নাটি ভেবে উনি সকাল থেকে সন্ধ্যের মধ্যে মাত্র তিনটি সট নিলেন।

প্রথম দিককার অর্থকষ্টের কথা উঠলেও এখন সত্যজিৎ প্রযোজকদের কাছে সোনার খনি। বিদেশে যে বিরাট অর্থ লাভ হয় তার সবটাই বিশাল লাভ। অবশ্য বিরূপ সমালোচনাও আছে। যেমন ফ্রাসোয়া ত্রুফো 'পথের পাঁচালী' দেখতে গিয়ে মাত্র দু' রীল দেখে হল থেকে বেরিয়ে যান। নিউ ইয়র্ক টাইমসের বোসলে ক্রোথার বা কেনেথ টাইনান-এর মতে কৃষকদের জীবন নিয়ে গঠিত ছবিটি যথেষ্ট ক্লান্তিকর।

অনেকের মতে রায় যে পদ্ধতিতে অভিনেতাদের মেশান তা অনেকেরই অপছন্দ। সত্যজিৎবাবুর পদ্ধতি হচ্ছে, পেশাদার অভিনেতা আর অপেশাদারে মেশানো। এই পদ্ধতিতে উনি আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছেন।

রায় বললেন, 'অপরাজিত' ছবিতে কয়েকজন চীনা অভিনেতাদের দরকার ছিল। সটটা ছবিতে দেড় মিনিট থাকবে। কিন্তু তাদের পাওয়া মুশকিল। শেষে চীনেদের পতিতালয়ে গেলাম।

ছোট্ট ঘুপসী ঘরে সত্যজিৎ বসে-ছিলেন। চারিদিকে গাঁজার গন্ধ। ওখানকার কর্তৃপক্ষ ভাবছিলেন রায় কোন মেয়ের সন্ধানে গিয়েছেন। পরে অবশ্য তারা ভুল বুঝতে পেরেছিল।

চিত্রকল্প
দিনরাত্রি

জন রাসেল

ছোট নাগপুরের পাহাড়ে কলকাতা থেকে উদ্দেশ্যহীনভাবে পালিয়ে যাওয়া চারটি যুবকের কয়েকদিনের ছুটি উপভোগের কাহিনী 'অরণ্যের দিনরাত্রি'। ছবিটি একটু ভিন্নধর্মী। ওদের জীবনের সংকট রূপায়ণের এক তথ্যনির্ভর দলিল, যা সত্যজিতেরই বৈশিষ্ট্য।

ছবিটি সাম্প্রতিক বাংলাদেশের সংকটের আগে তোলা, কিন্তু পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রন্ট পরিচালিত সরকারের পতনের খুব একটা আগে নয়। শান্ত গ্রাম্য জীবনের ওপর 'পথের পাঁচালী' তোলার কয়েক বছর আগেই সত্যজিৎ দেখেছিলেন ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ। যখন তাঁর দক্ষিণ কলকাতার মধ্যবিত্ত অঞ্চলে চোখের সামনে মানুষ না খেয়ে মরেছে। সমাজের ক্রমবর্ধমান সংকট ও দুঃখকে নিজের ছবি গ্রাস করতে দেন নি সত্যজিৎ। তাকে প্রয়োজন মত ব্যবহার করেছেন।

পাশ্চাত্যের পক্ষে রায়ের ছবি বোঝা একটু শক্ত। 'পথের পাঁচালী'র তিনটি ছবিই এদের ভাল লেগেছিল। দেখে শৈশবের স্মৃতিকে কবিতার মত সুরেলা মনে হয়েছিল। মহৎ ছবি 'চারুলতা'র বৈভবের জন্য ভাল লেগেছিল। কিন্তু তবু কখনও কখনও তাকে একটু ধীরগতিসম্পন্ন মনে হয়েছিল। যদিও তার ছবির মূল সুরটি সব সময়ই জীবনকে ছুঁয়ে গেছে, তবু কখনও কখনও তাকে এককথায় সঙ্গীতের মূর্ছনার মত এলোমেলো মনে হয়েছে। এরা কখনও বলেন যে শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনের ওপর—যার থেকে উনি নিজে অনেকটা দূরে—সত্যজিৎ রায় বারে বারে ছবি করেন। অনেকে বলেন উনি অপু-ত্রয়ের মত আর কোনও ভাল ছবি করেন নি। আমি বিশ্বাস করি না। 'অরণ্যের দিনরাত্রি' আমাকে সেকথা বিশ্বাস করতে দেয় না।

সত্যজিৎকে চেনা যায় ওঁর সেটে। বোম্বাই ছবির তুলনায় বাংলা ছবির কী ভীষণ দৈন্য দশা; তারই মধ্যে কাজ করেন রায়। তার ওপর বাংলাভাষাভাষী দুই তৃতীয়াংশের কাছে সে ছবি আদৌ পৌঁছয় না। বিশাল ভারতীয় দর্শকদের কাছেও নয়।

দাদা-কালোয় তোলা জনপ্রিয় বাংলা ছবি উত্তম-সুচিত্রা তারকান্বিত হয়। পর পর পরিচিত সাধারণ ঘটনা দিয়ে শেষ হয়, নায়িকার চোখের জলের ক্লোজ-আপে। তপন সিংহের 'অতিথি' ছবিতেও দেখি নদীর ওপর সব ক'টা নৌকোরই পাল নতুন, চাষারাও বালিগঞ্জের বাংলায় কথা বলে।

সত্যজিৎ রায় তাঁর দেশ ও জনগণের ধ্রুবসত্যটা খুঁজতে গিয়ে বাংলা দেশের লেখকদের বড় কাছাকাছি চলে এসেছেন। তাঁদেরই একজন হয়ে গেছেন। উনি কাগজ-কলমের বদলে ছবির মাধ্যমে লিখে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী থেকে উনি গ্রাফিক আর্ট শেখেন। ইংল্যাণ্ডে যেমন সেক্সপীয়র, বাংলায় তেমনি রবীন্দ্রনাথের ছোঁয়া সব কিছুরই মধ্যে। রাবীন্দ্রিক স্পর্শ থেকে সত্যজিৎ নিজেকে মুক্ত করতে পারেন নি—অপু-ত্রয় তার প্রমাণ।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে খুব কমই তা ওঁর ছবিতে প্রকট। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার, অন্যকে হেয় করার ভেতর যে অশুভের জন্ম কিংবা অন্যের ওপর কিছু চাপিয়ে দেওয়া ইত্যাদি সম্বন্ধে কবির বাণী খুব দক্ষতার সঙ্গে উনি ব্যবহার করেছেন, সত্যজিতের ছবির সবচেয়ে মর্মস্পর্শী দিকটি হচ্ছে সমস্ত মানুষের পরেই তাঁর সতর্ক সম্মানবোধ। অপু চিত্রে যেমন হাঁটতে হাঁটতে বাপ ও ছেলের মিলন হল কিংবা



চারুলতায় স্বামী-স্ত্রীর হাত কাছাকাছি পৌঁছেও তা ছোঁয়া গেল না।

সরল গ্রাম্য জীবনের ওপর তোলা অপুত্রয় বা দেবী—রবীন্দ্রনাথ, বিভূতি-ভূষণ বা অন্যান্যদের লেখা থেকেই ছবি করে উনি খুশী হতেন। কিন্তু সেও তো অনেক হল। মন্থর জীবনের ওপর এখন ওই গ্রাম্য জীবনের সরলতা গভীরভাবে দাগ কেটে গেছে। কিন্তু এ ছবিতে উনি শহুর কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের অনেকখানি কাছাকাছি এসেছেন।

'জলসাঘর' ও 'চারুলতা'র মত দুটি অপূর্ব ছবির ভেতর উনি ক্ষয়িষ্ণু জমিদার, যিনি তাঁর ব্যবসার চাইতে শিল্পকলাকে বেশী ভালবাসতেন, এবং ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ১৮৭০ দশকের উদারপন্থীদের দেখিয়েছেন। এইসব চরিত্রগুলো সুদূর প্রবাসী, ছোট্ট গণ্ডীর ভেতর তাদের জীবনের উত্থান-পতন ও মহত্ত্ব দেখান হয়েছে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে।

সত্যজিৎ প্রথম কলকাতার ওপর ছবি করলেন 'মহানগর'। শহরের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকা এক মধ্যবিত্ত দম্পতির জীবনালেখ্য। দুজনেরই চাকরি নেই, তবু স্বামী-স্ত্রী উভয়েই খুশীমনে ফিরছে দেখে অনেকেই শেষ দৃশ্য সম্বন্ধে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু জীবন্ত কলকাতায় সেইটেই স্বাভাবিক বলে আমার মনে হয়েছে।

খোলাখুলিভাবে না হলেও সত্যজিৎ বড়লোকদের কথা 'কাঞ্চন-জঙ্ঘা'য় বলেছেন। ছবিতে কতকগুলো সূক্ষ্ম কাজ থাকা সত্ত্বেও মনে হয়েছে সংঘর্ষগুলো যেন একটু বেশী সরলীকৃত। ছবিটিকে অবশ্য 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র প্রস্তাবনা রূপে গণ্য করা যেতে পারে, যাতে কলকাতার সেই সমাজ নিয়ে আরো একটা 'ট্র্যাজিকমেডি' চিত্র রচনা করেছেন।

রায়ের অন্য ছবির মত 'অরণ্যের দিনরাত্রি'ও সমবেদনার ছবি। ব্যাপারটা বেশ কঠিন—কিন্তু জরুরী। এটা আবার অন্ন, ক্ষমতা ও শ্রেণীর ব্যাপারও। পশ্চিমী পোশাক পরা এ ছবির তরুণরা সকলেই উচ্চবর্ণের, সকলেই চাকরি করে তবু খুশী নয়, কেউ কেউ হয়ত মার্কসিস্টও—গরীবকে ঠকায়। এমন কি কলকাতার মেয়েটিও নিজের সম্বন্ধে খুব সতর্ক—পাঁচ টাকার নোটের ওপর ফোন নম্বর লেখে, কেননা আর কাগজ নেই। শেষ পর্যন্ত কেয়ারটেকারের অসুস্থ স্ত্রী ও তার ছেলে-মেয়েরাই ছবির বলি হয়। ওদের জীর্ণ ঘরের জানালা দিয়ে বাইরের পৃথিবী তখন চোখের ওপর ভেসে উঠে, ব্যস।

তবু ছবিটা হাস্যরসাত্মক। একটা প্রেম ভেঙে গেল, আর একটা প্রেম কিছুটা এগোল। হয়ত দানা বাঁধবে। এটা কোনও বিশেষ বক্তব্যের ছবি নয়, কিছুই স্পষ্ট করা হয় নি। দেখতে দেখতে চরিত্রগুলোর সঙ্গে মিশে যেতে হয়। সেই অভিজ্ঞতা অনেক দিন মনের মধ্যে অনুসরণ করে। সত্যজিৎ রায় যদি বাংলাদেশের ওপর ছবি করেন তাহলে তাও ঠিক স্বয়ংসম্পূর্ণ ও গভীর হবে।

খোয়াই ও একটি নিঃসঙ্গ তালগাছ

বেশ কিছুদিন আগে, আমাদের ছেলেবেলায়, পথে-ঘাটে একটি গান ভিক্ষুকদের মুখে শোনা যেত, 'নয়ন মুদিলে যদি দেখা পাই, অন্ধ করিয়া দাও হে।'—অন্ধের বেদনা ও ঈশ্বরাকুতি এতে প্রকাশিত। কিন্তু অন্য একটি অর্থেও এটিকে গ্রহণ করা যায়। আমরা বেশীর ভাগ মানুষ চোখ থাকতেও অন্ধ—কোন রঙ, কোন সৌন্দর্য আমাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু যে মানুষ চোখে সুন্দরের প্রদীপ জালিয়ে আনেন তাঁর দৃষ্টিহীনতা অবশ্যই বেদনার, যদিও আর এক অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তাঁরা সব অভাব পূরণ করে নেন। হয়তো সে দৃষ্টি সাধারণ চোখের চেয়ে অনেক বেশী উজ্জল ও অন্তর্ভেদী। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় এমনি একজন অনন্ত দৃষ্টিসম্পন্ন চিত্রশিল্পী।

১৯১৮ সালে বিনোদবিহারী শান্তিনিকেতনে এলেন ছাত্র হিসাবে। এর মূলে ছিলেন শান্তিদেব ঘোষের বাবা কালীমোহন ঘোষ। বিনোদবিহারীর দাদার সঙ্গে কালীমোহনের আলাপ ছিলো, তাই একদিন বললেন, তোমার ভাইটিকে গুরুদেবের আশ্রমে পাঠিয়ে দাও। ততদিনে তিন-চারটে ইস্কুলে পড়া হয়ে গেছে বিনোদবিহারীর, কিন্তু পড়াশুনা তেমন হচ্ছিল না। চোখ খারাপ, অনেক ওষুধ-পত্র, চিকিৎসা করেও কোন সুফল হচ্ছিল না, তবুও যেহেতু আঁকা-ঝোঁক ছিলো ছেলেবেলা থেকেই, ডাক্তার পরামর্শ দিলেন আঁকতে চায় তো আঁকাই শেখান, পাঁচ রকম কাজ না করাই ভালো। তাইতেই কালীমোহনের কথা মতো অভিভাবকরা বিনোদবিহারীকে পাঠিয়ে দেন শান্তিনিকেতনে।

কালীমোহনবাবু বালক বিনোদবিহারীকে নিয়ে গেলেন গুরুদেবের কাছে। চোখের অবস্থা তিনি আগেই শুনেছিলেন, দেহলিতে গিয়ে গুরুদেবকে দেখলেন, শুনলেন আশ্রমে সব কাজকর্ম নিজের হাতেই করতে হয়। বিনোদবিহারীর ভয় ছিলো হয়তো তাঁর চোখের জন্যে আশ্রমে থাকা হবে না। কালীমোহনের সঙ্গে গুরুদেবের কী কথা হয়েছিলো কে জানে, বিনোদবিহারী কিন্তু ঘর ঝাঁট দেওয়ার কাজ থেকে রেহাই পেয়ে গেলেন।

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়



শিল্পগুরু নন্দলালের তত্ত্বাবধানে শিল্পচর্চা চললো বিনোদবিহারীর, প্রথম দিকে কাজ ছিলো জগদানন্দ রায়ের বইয়ের জন্য পোকা-মাকড়ের ছবি আঁকা। দাওয়ায়, মেঝেতে কত রকমের পোকা-মাকড় ঘুরে বেড়ায়, আঁকতে গেলে দেখতে হবে, দেখার সবচেয়ে বড়ো সুযোগ ঝাঁট দেওয়া, তাই ও কাজ থেকে রেহাই পাওয়াতে জগদানন্দ বোধহয় খুব খুশী হন নি, বলেছিলেন, ছবি যখন আঁকছো তখন ঘর ঝাঁট দেবে না কেন বাপু!

বিনোদবিহারী যে পরিবারে জন্মেছিলেন তাঁরা ছিলেন, সেই ১৯০৩ সালেও বেশ আধুনিক, বিনোদবিহারীর ভাষায় সংস্কারমুক্ত, কিঞ্চিৎ ব্রাহ্মভাবাপন্ন। ওঁর একমাত্র দিদি বিধবা হয়েছিলেন, সেকালে তাঁর আবার বিয়ে

দেওয়া হয়েছিলো। সেটা ছিলো বাংলাদেশের চতুর্থ বিধবা বিবাহ। বিনোদবিহারীরা ছ'ভাই, তিনি ছোটো, মেজদা বনবিহারী ছিলেন নামকরা কার্টুনিস্ট, পুরানো 'ভারতবর্ষ' আর 'শনিবারের চিঠি'তে তাঁর ছবি বেরুতো। আর এক দাদা, বিজনবিহারীও গুণীলোক ছিলেন, ভাল লিখতে পারতেন। বিনোদবিহারীর ওপর এঁদের দুজনেরই প্রভাব ছিলো।

জীবনের বেশীর ভাগ সময় শান্তিনিকেতনে কাটিয়েছেন, সেখানে ছাত্র হয়ে গেছেন, শিক্ষক হয়ে থেকেছেন, এখনো শান্তিনিকেতনে আছেন। শান্তিনিকেতনের 'কলা ভবন' ছাড়া কিছু সময় থেকেছেন কাঠমাণ্ডুতে, পাটনায়, মুসৌরীতে। ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসের তিনি একজন বিশেষজ্ঞ। ক্ষীণ দৃষ্টি নিয়ে অসাধারণ সব কাজ করেছেন। ৬৮ বছর বয়সে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেছেন, তবু শিল্পচর্চা ছাড়েন নি, অন্তরে শিল্পীর যে আর এক নয়ন আছে তাই দিয়ে তিনি অনেক কিছু দেখেছেন, কাজ করেছেন নানা জাতের —মোমের মডেল, রঙীন কাগজের টুকরো কেটে 'কোলাজ', বিস্ময়কর সব 'মুরাল'। একটি প্রবন্ধে সত্যজিৎ রায় লিখেছেন ১৯৫০ সালের ৭ই পৌষের মেলা দেখতে গিয়ে বিনোদদার সাম্প্রতিকতম শিল্পকীর্তির সঙ্গে পরিচিত হন। ভারতীয় মধ্যযুগীয় সাধুসন্তদের জীবনকে কেন্দ্র করে হিন্দী ভবনের তিনটি দেওয়ালে আঁকা মিউর‍্যাল। বর্তমান শতাব্দীতে আমাদের দেশে এর চেয়ে মহৎ ও সার্থক কোন শিল্পকীর্তি রচিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। বিনোদবিহারীর কাজের সঙ্গে অপরিচিত কোন প্রকৃত শিল্পরসিক যদি কেউ থেকে থাকেন, আমি তাঁকে অনুরোধ করি তিনি যেন অবিলম্বে শান্তিনিকেতনে গিয়ে এই 'মিউর‍্যাল'টি দেখে আসেন।

অন্ধ অবস্থাতেই তিনি আবার একটি নতুন মিউর‍্যালের পরিকল্পনা করেছেন। সবই তাঁর দেখা জিনিস, অনেক কালের চেনা জিনিস, জানা জিনিস। চানাচুরওয়ালা, কাঁধে বাঁক-বওয়া মানুষ, ঝুড়ি মাথায় মেয়ে, বৈষ্ণব বৈষ্ণবী, এমনি সব নিজের চোখে দেখা সাধারণ ব্যাপার। টগবগে তাজা মানুষের প্রতি বিনোদবিহারীর অসীম আগ্রহ, তিনি নিজেই বলেছেন, বাড়ির বাইরে মিউর‍্যাল, সামনে দিয়ে লোক

বিনোদবিহারীর ওপর তথ্যচিত্র 'দি ইনার আই'-এর জন্যে শান্তিনিকেতন কলাভবনের সামনে সাম্প্রতিক মুগালস-এর চিত্রগ্রহণ করছেন সত্যজিৎ রায়





বিনোদবিহারীর আঁকা বনস্থলীর (রাজস্থান) ফ্রেস্কো চিত্র

যাবে-আসবে, দেখে অন্তত বুঝতে পারবে এগুলো মানুষ।

সত্যজিৎ রায় এই মহৎ শিল্পীর নিবিড় সস্নেহ সাহচর্য পেয়েছেন, কাছ থেকে মানুষটিকে দেখেছেন ও বুঝেছেন।

সুতরাং এঁর জীবনীচিত্র করার তিনিই উপযুক্ত অধিকারী। ভারত সরকারের ফিল্মস ডিভিসনের উদ্যোগে বিনোদবিহারীর জীবন ও শিল্পকর্ম অবলম্বনে 'দি ইনার আই' নামে তথ্য-চিত্রটি সম্প্রতি শেষ হয়েছে। এই চিত্র পরিচালনাসূত্রে শ্রীরায় বিনোদবিহারীর অজস্র রচনাবলী পাঠ করেছেন, বনবিহারীর কার্টুন সংগ্রহ করেছেন, বিজনবিহারীর লেখা দেখেছেন, একথায় গোটা পারিবারিক সংস্কৃতিক তথা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের যুগ-মানসকে ধরবার চেষ্টা করেছেন।

বিনোদবিহারীর তৈরি একটি মোমের মূর্তি





বিনোদবিহারী, সত্যজিৎ রায় ও ক্যামেরাম্যান সৌমেন্দু রায়

বিনোদবিহারী উপলক্ষ মাত্র। লক্ষ্য ভারতীয় চিত্রকলার বিবর্তন দেখান। বিনোদবিহারীর জীবনে বীরভূমের লালমাটি রুক্ষ শুষ্ক বাতাস জড়িত হয়ে আছে। প্রায় প্রিমিটিভ একটি জীবন-প্রবাহ, তার সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা নিয়ে তাঁর চোখে নিত্যনূতন মহিমায় প্রতিভাত হয়েছে, ছবিতে তা ধরেছেন, সত্যজিৎ তাঁকে ক্যামেরায় ধরেছেন সেই সব প্রিয় ছবির পৃষ্ঠপটে।

এই তথ্যচিত্রটি নির্মাণ করতে শ্রীরায় নীরবে যে অসীম পরিশ্রম করেছেন তাতে মনে হয় ডকুমেনটারির ক্ষেত্রে 'দি ইনার আই' একটি অনন্য সংযোজন হবে। কাঠমাণ্ডু, বেনারস, রাজস্থান, কলকাতা, এবং বলা বাহুল্য শান্তি-নিকেতনে এ ছবির স্যুটিং হয়েছে। শান্তিনিকেতনে যখন সত্যজিৎ বিনোদ-বিহারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তখন শিল্পী তাঁর যৌবনের প্রিয় অনুষঙ্গ, বীরভূমের বাউলী-উদাসী পরিমণ্ডলের কথা শ্রীরায়কে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, বলেছেন, তোমার ফিল্মে খোয়াই দেখাবে তো? একটা জায়গায় খোয়াই এখনো আছে প্রান্তিক স্টেশনের দিকটায়। খোয়াই ও তাতে একটা সলিটারী তাল গাছ, আমার স্পিরিট, আমার জীবনের মূল ব্যাপারটা যদি কোথাও পেতে হয়, তাহলে ওতেই পাবে।

খোয়াই ও একটি নিঃসঙ্গ তাল গাছ—তারই নাম বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়।

সত্যজিতের চোখে

ভারতীয় সংবাদপত্র আমাকে কোন ভাবেই প্রভাবান্বিত করতে পারে নি। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে ভারতীয় পত্রিকাগুলো কি আমার ছবির সম্পর্কে অথবা অন্য ছবি সম্পর্কে মোটেই ওয়াকিবহাল নয়। আশার কথা কোন কোন সমালোচক আন্তর্জাতিক মতামতের সঙ্গে যতটা সম্ভব তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করছেন। কিন্তু নিখুঁত ধারণা না থাকলে জ্ঞান কোন কাজেই লাগে না। এই অভাবটাই আমাদের দেশের সমালোচকদের সবচেয়ে বেশী। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, প্রথম শ্রেণীর সমালোচক হতে পারলে চিত্র-পরিচালক হওয়া মোটেই শক্ত নয়।

আমার ছবির স ব চে য়ে ভাল সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে বিদেশে।

কোন একটি বিশেষ ছবি সম্পর্কে যদি সমালোচকেরা বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন তাহলে তাতে এমন একটি ওজন তৈরী হয় যা কোন পরিচালকই উপেক্ষা করতে পারেন না। পরিচালক ছবি তৈরী করার সময় একটি নিজস্ব ধারণা পোষণ করেন সব সময়, সমালোচনার মাধ্যমে তিনি যাচাই করে নেন তাঁর নিজস্ব সেই ধারণা।

সেন্সার সম্পর্কে কি নীতি অবলম্বন করা হয় আমার জানা নেই। ব্যক্তিগত ভাবে আমি মনে করি এই সেন্সার তুলে দেওয়া উচিত, আবার এটাও ভাবি যে সাধারণ ভারতীয় দর্শকদের কথা চিন্তা করে এক ধরনের সতর্কতা নেওয়া উচিত। বার্জম্যানের 'সাইলেন্স' ছবিটি পুরোপুরি শিল্পসম্মত ছবি। কিন্তু সাধারণ দর্শকের কাছে এটি একটি অশ্লীল ছবি বলে মনে হবে। অশ্লীল সাহিত্যের প্রভাবের মতই এর প্রভাব অনুভূত হবে। কাজেই এই ধরনের ছবি দেখাতে গেলে ছবিটি পুরোই দেখানো উচিত, কেটে ছেঁটে নয়। কেননা কাট-ছাঁট ক রা টা ঘোরতর অন্যায় হবে। অথবা ছবিটি না দেখানই উচিত।

ভারতীয় ছবির পুরস্কারের ব্যাপারে নগদ দেওয়াই ভাল; যদি মোটামুটি একটি অংশ পরিচালক পান। পুরস্কারের দৌলতে প্রযোজক ত' যখন তখন টাকাকড়ি রোজগার করতে পারেন। কিন্তু পরিচালক, যিনি ছবি তৈরী করেন তিনি প্রাইজ-মানির দৌলতে কিছুই পান না। পরিচালকের বিচার হয় সব সময় বক্স-অফিস দিয়ে পুরস্কারের মানদণ্ডে নয়।

ভারতীয় পরিচালকদের পক্ষে বিদেশী পুরস্কার অনেক সাহায্য করে। বিদেশে বাজার পাওয়া যায়। বিদেশী প্রদর্শকদের কাছে ভারতীয় পুরস্কারের কোনও দাম নেই।

ভারতীয় ছবি তৈরী করতে গেলে টাকাকড়ি পাওয়া খুবই মুশকিলের ব্যাপার। তবে 'অপরাজিত' করার পর থেকে টাকাকড়ি যোগাড় করা আমার পক্ষে খুব একটা কঠিন ব্যাপার হয়ে উঠে নি।

জনপ্রিয় রুচির তাগিদে গ্রীক নাটক, সেক্সপীয়র, ম্যাজিক ফ্লুট, চ্যাপলিন এবং ওয়েস্টার্ণ-এর জন্ম হয়েছে। কাজেই জনপ্রিয় রুচিতে শিল্পসম্মত সৃষ্টি কোনমতেই অসম্ভব নয়। সাধারণভাবে স্বীকার করতে হবে ভারতে যাঁরা ভাল ছবি তৈরী করবেন তাঁরা সীমিত গোষ্ঠীর জন্যে ছবি করবেন না। তার মানে এই নয় যে আপোষ করতে হবে। কিছু কিছু ভাগ ছবির উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে যে জনপ্রিয় ছবিগুলির মধ্যেও শিল্পরীতি আছে। চ্যাপলিন, কিটন, ডি-সিকা, ফোর্ট লুসি এঁদের নাম এই প্রসঙ্গে করা যেতে পারে। মানবতাভিত্তিক গভীর শিল্পসম্মত ছবি সব সময়ই বৃহৎভাবে গৃহীত হয়।

ইউরোপে আপাতত কোন আন্দোলন চলছে—সেই সম্পর্কে আমি খুব বেশী সচেতন নই। তবে কিছু কিছু ইউরোপিয়ান দেশে লক্ষ্য করার মত একটি ভাব দেখা যাচ্ছে। যেমন কম খরচায় এবং বেশী জটিলতা সৃষ্টি না করে স্যুটিং। এইজন্যে পোর্টেবল লাইট, ক্যামেরা ও শব্দযন্ত্রই সাহায্য করছে অনেক বেশী। এতে চলচ্চিত্রের ভাষাও প্রভাবিত হচ্ছে। সম্ভবতঃ গদার ও ত্রুফো এটি সুরু করেছিলেন। এখন আমেরিকাও এই রাস্তা ধরেছে (সানসেট বুলভার্ট)। বৃটেনে রিচার্ডসন, হেজ, প্রেটন, ইটালির পেত্রো, ওলমি ছাড়াও চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী এমনকি জাপানেও (হানি) এই ধরনের ছবি হচ্ছে। যন্ত্রের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের যে ব্যবহার

(যৌনতার ওপর একটু বেশী জোর দিয়ে); এই দুটো ব্যাপারই আধুনিক সিনেমায় প্রবলভাবে দেখা যাছে।

ভারতের টি ভি যদি বেতার বিচিত্রা ও ভারতীয় ছবির একটি জুটি হয় তাহলে তা এক বীভৎস ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি না বাজার চলতি ভারতীয় ছবির কাঠামোর বাইরের কোনও প্রভাব পড়তে পারে।

নিজের ছবি সুরু করার আগে আমি প্রচুর ছবি দেখতাম। পুরোনো ছবিগুলির মধ্যে নীতিন বসুর প্রেসিডেন্ট ও ধরতি মাতা আমার ভাল লেগেছিল আঙ্গিকের জন্য, প্রথম যে বাংলা ছবিতে আমি সমসাময়িক ভাবনা খুঁজে পেয়েছিলাম তা হলো বিমল রায়ের 'উদয়ের পথে'। প্রথম যে ভারতীয় ছবিটি আমাকে নাড়া দিয়েছিল তা হল 'দো বিঘা জমিন'। যোগীন দাসের 'রামশাস্ত্রী'ও আমার ভাল লেগেছিল।

ছবি তৈরীর যাবতীয় কাজে, ক্যামেরার কাজেও একজন পরিচালকের মোটামুটিভাবে ওয়াকিবহাল থাকা দরকার। কেননা পরিচালকই একমাত্র লোক যিনি জানেন কখন কোনটা দরকার। আমি যতদূর সম্ভব ততদূর নিজেই কাজ দেখাশোনা করি। তার মানে অবশ্য এই নয়, আমার বিশেষজ্ঞের অভাব আছে।

প্রসঙ্গতঃ এটা বললে ভুল হবে যে চ্যাপলিন তাঁর ছবির সব ব্যাপারই নিয়ন্ত্রণ করেন। চ্যাপলিন লেখেন, পরিচালনা করেন, অভিনয় করেন এবং নেপথ্য সংগীতও তৈরী করেন। কিন্তু ঐকতান (অর্কেস্ট্রা) নিজে তৈরী করেন না, তা করান পেশাদারদের দিয়ে। তাদের পরে চ্যাপলিনের ছবি ফটোগ্রাফির দিক থেকে খুবই খারাপ হয়েছে, বিশেষ করে তাদের আলোকসম্পাতের ব্যাপারে। অনুমান করা যেতে পারে চ্যাপলিন ক্যামেরা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না অথবা আলোকসম্পাত সম্পর্কে তার জ্ঞান যথেষ্ট নেই।

একথা সত্যি যে সমসাময়িক জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে আমি সবসময় আকৃষ্ট হই না। গল্পের মধ্যে আমি প্রথমেই লক্ষ্য করি মানবিক আচরণ বিধির মধ্যে কোনও ন্যায়সঙ্গত সম্পর্ক আছে কিনা। কতকগুলি গল্পের মধ্যে এই গুণগুলি শাশ্বতভাবে থাকে, যেমন, অপু, পোস্টমাষ্টার, চারুলতা। আবার কতকগুলি গল্পের মধ্যে এই গুণগুলো নিহিত থাকে অতীতে (যেমন 'দেবী', 'জলসাঘর') অথবা বর্তমানে (যেমন 'মহানগর', 'কাপুরুষ', 'নায়ক') সমসাময়িকতার বিরুদ্ধে আমার কোনও বৈরীভাব নেই। গল্পের মধ্যে যদি সিনেমার উপকরণ থাকে, তাহলে সে গল্প নিতে আমি এতটুকু দ্বিধা করি না।



কেউ কেউ মনে করেন ভারতীয় নারী সম্পর্কে আমি খুব বেশী সহানুভূতিশীল, আমার ছবিতে একটি ভারতীয় মেয়ের চরিত্র পুরুষের চেয়ে বেশী স্পষ্টতর হয়। অনেকে আমায় জিজ্ঞেস করেছেন, ভারতীয় পুরুষের মধ্যে কী কোনও প্রচণ্ডতা নেই? সৌমিত্র কী সত্যি কাপুরুষ?

এ অভিযোগ যদি সত্যি হয় তাহলে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম ও শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধেও এই অভিযোগ করতে হবে। ওপরের বক্তব্যটি 'মহানগর', 'চারুলতা', 'কাপুরুষ', 'নায়ক' ও 'তিনকন্যা'—এই পাঁচটি ছবি সম্পর্কে প্রযোজ্য হতে পারে। সুতরাং সর্বাত্মক মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক।

আমার তিনটি ছবিতে—'মহানগর', 'চারুলতা', 'কাপুরুষ'—নায়িকারাই মূল ভূমিকাগুলি অভিনয় করে গেছেন, কিন্তু আমার অন্যান্য ছবিগুলিতে এই রকম কিছু দেখা যাবে না ('অপু', 'দেবী', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা', 'জলসাঘর', 'পরশপাথর'), আমার মনে হয় নায়িকাদের সম্পর্কে আমার সহানুভূতির প্রশ্নটি একেবারেই অবান্তর। আমার আরও মনে হয় অনেক প্রতিভাসম্পন্ন ঔপন্যাসিক (রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র) এবং পরিচালক নায়িকাদের স্বভাবতই ভূমিকাপ্রধান করেন যাতে বুদ্ধিজীবী পুরুষের চাঞ্চল্য ভালভাবে প্রকাশ করা যায়।

'কাপুরুষ'এ অমিতাভ (সৌমিত্র) এই জাতীয় একটি চিন্তাশীল পুরুষের উদাহরণ। যে পুরুষ কোনও বিশেষ মুহূর্তে নানা চিন্তার পর কোন কাজ করার চেষ্টা করেন। ফ্ল্যাশব্যাকে দেখান হয়েছে অমিতাভ কিভাবে তার অনিশ্চয়তা বৃত্তিকে যুক্তিসঙ্গত করার চেষ্টা করছে, এবং একই সঙ্গে বিশেষ এক ধরনের কাপুরুষতাকে ঢাকবার চেষ্টা করছে, এতে মধ্যবিত্ত জীবনের বিদগ্ধতার কোনো স্বার্থপরতার স্বরূপ



ধরা পড়ে। আধুনিক জীবনের অনিশ্চয়তা এই মানসিকতার অন্যতম কারণ।

'কাপুরুষ'এর মূল গল্পে অমিতাভ অবশ্য এই মানসিকতা কাটিয়ে উঠেছিল। সে মেয়েটিকে ভালও বেসেছিল এবং তার তথাকথিত কাপুরুষতার জন্যে ক্ষতি পূরণ করারও চেষ্টা করেছিল।

শিশুদের ব্যাপারে আমার ধারণা, তাদের প্রাপ্তবয়স্ক বলেই মনে করা উচিত। প্রত্যেকটি শিশুই স্বাভাবিক অভিনেতা নয়, কাজেই বিভিন্ন শিশুকে বিভিন্নভাবে দেখা উচিত। মহানগরের শিশুকে পরিচালনা করা সহজ ব্যাপার ছিল। কিন্তু 'পথের পাঁচালী'র অপুকে পরিচালনা করা ছিল বিশেষ কঠিন।

আমার ছবিতে খুব বেশী পেশাদার অভিনেতৃ থাকে না। আমার তৃতীয় ও চতুর্থ ছবিতে ('জলসাঘর' ও 'পরশ-পাথর') প্রায় সবাই পেশাদার ছিলেন। আমি চেষ্টা করছি পেশাদার ও অপেশাদারদের একসঙ্গে আনতে। এতে ছবির গুণ নষ্ট হয় না। শুধু দেখতে হবে, পেশাদার ও অপেশাদার কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এবং তাতেই ছবির গুণ নির্ণীত হয়।

পেশাদারদের কিছু কিছু ম্যানারিজম আছে, তবে তাঁদের যদি ভালভাবে লেখা সংলাপ দেওয়া যায় তাহলে তাঁরা চরিত্রটিকে মানুষ বলেই মনে করবেন, টাইপ বলে নয়। 'নায়ক'-এ উত্তমকুমার এই ম্যানারিজমকে ভালভাবেই এড়িয়ে গেছেন।

বাংলা ছবির সাবটাইটেল করা দরকার অবাঙালীদের জন্যে। কতকগুলো বিশেষ ক্ষেত্রে ডাবিংও চলতে পারে (অবাঙালী নিরক্ষর দর্শকদের জন্যে)। কিন্তু নন্দনতত্ত্বের দিক থেকে এটি মোটেই সন্তোষজনক নয়।

সঙ্গীতের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে আবেগ ও পরিবেশের জন্যে। সঙ্গীত পঞ্চাশ দশক অবধি ব্যবহৃত হত তর্কাতীতভাবে। কিন্তু এখন আর সেভাবে হয় না। অনেক পরিচালকই সঙ্গীতহীন ছবি করেছেন। আন্তনিওনি সঙ্গীত বাদই দিয়েছেন। বার্গম্যান খুব কমই ব্যবহার করেন। কিন্তু ক্রুফো ও গদার প্রচুরভাবে সঙ্গীত ব্যবহার করেন। সবটাই নির্ভর করে পরিচালকের ধারণার ওপর। মাঝে মাঝে ছবির রূঢ়তাকে কোমল করার জন্যে সঙ্গীতের দরকার হয়। আগেকার দিনের অবাস্তববাদী ছবিতে প্রচুর নেপথ্য সঙ্গীত ব্যবহৃত হত। চোখের সামনে দেখা রূঢ়তাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে।

আইজেনস্টাইনের ছবিতে, প্রকিয়েভের ছবিতে এবং ডি সিকার পুরোনো ছবিতে সুন্দরভাবে সঙ্গীতের প্রয়োগ হয়েছে। অনেক খারাপ ছবিতেও সঙ্গীতের প্রয়োগ সুন্দর। প্রচণ্ড সঙ্গীত মূর্চ্ছনার ট্র্যাডিসান আজ মৃতপ্রায়। কোন কোন ছবিতে একটি মাত্র বাদ্যযন্ত্রেই (খার্ডম্যান) সঙ্গীতের কাজ সুন্দরভাবে করা হয়েছে।

বম্বে এবং দক্ষিণ ভারতের চলচ্চিত্রে আগামী দিনে কি হবে আমি বলতে পারি না। তবে বাংলা ছবির বাজার অত্যন্ত ভয়াবহ। বিদেশী বাজার না থাকলে, ব্যক্তিগতভাবে, আমি হয়ত টিঁকতে পারতাম না। নতুন কোনও প্রতিভা জন্ম নিলে সে এখানে কোনও রকম ভবিষ্যৎ পাবে না। আভাগার্দিজম এখানে অচল।

সত্যজিৎ একটি ঐতিহ্য
পেনিলোপ হাউসটোন

ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্প বিপুল এবং জনসাধারণও নিয়মিতভাবে আগ্রহের সঙ্গে ছবি দেখে থাকেন। কিন্তু ভাষার অলঙ্ঘনীয় বাধার জন্যে একই ছবি সমানভাবে জনপ্রিয়তা নাও অর্জন করতে পারে। যেমন বাংলা ছবি বোম্বেতে সহজভাবে বোঝা যাবে না। এর অর্থ কোন পরিচালক সমগ্র দেশের জন্য ছবি তৈরী করতে পারছেন না। জনপ্রিয় নায়করা নানা ব্যানারে একই সঙ্গে ছবিতে কাজ করছেন, ফলে তাঁদের ওপর বেশ চাপ পড়তে থাকে। ছবির মান অত্যন্ত নিচু। অভিনেতারা কম টাকা পারিশ্রমিক পান, যন্ত্রপাতিও তেমন নেই।

ভারতীয় ছবির যখন এই রকম অবস্থা তখন ১৯৫৬ সালের কান ফেস্টিভালে 'পথের পাঁচালী' বলে একটি ছবি পুরস্কার পায়। ছবির পরিচালকের নাম সত্যজিৎ রায়। সত্যজিৎ নিজে তখন একজন তরুণ পেশাদার শিল্পী। তিনি যে পরিবারে মানুষ হয়েছেন তার তুল্য বনেদী পরিবার বাংলাদেশে নেই বললেই চলে। শিক্ষা, রুচি, শিল্পবোধ সবকিছুর সমন্বয়। বিলেতের হাক্সলি পরিবারের সঙ্গেই তার একমাত্র তুলনা করা চলে।

১৯৫০ সালে যখন রেনোয়া 'দি রিভার' ছবির স্যুটিং করতে কলকাতায় গিয়েছিলেন, তখন তিনি শ্রীরায়কে বলেছিলেন যে হলিউডি কায়দা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলেই একমাত্র এদেশে ভাল ছবি করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে সিকোয়েন্স পত্রিকায় শ্রীরায়ের লেখা আমার মনে পড়ছে: ছবিতে আবেগের মত শিল্পসম্মত জিনিস আর নেই। কলাকৌশলও প্রয়োজনীয়, কারণ তা শুধু ছবির সুষমা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে।

সত্যজিৎ নিছক কল্পনা জগতের বাসিন্দা নন। তিনি ছবি করতে





আরম্ভ করলেন। তাঁর ইউনিট হল আটজন লোকের। যার মধ্যে একজন ছিলেন, যিনি এর আগে পেশাদারী কাজ করেছেন। প্রথম কাজ করতে যাবার দিন ভাঙাচোরা ক্যামেরা পাওয়া গেল। এই রকম প্রায় এ্যামেচার ইউনিট নিয়ে কাজ আরম্ভ করার পর, ছবিটি শেষ হতে প্রায় দু'বছর লেগে গেল। তাও শেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহায়তা না পেলে ছবিটি অসম্পূর্ণ থেকে যেতো।

রায় আরও লিখেছিলেন : কিভাবে পয়সার অভাবে ছবির কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল তা বর্ণনা করা শক্ত। এমন বিরক্তি এসে গিয়েছিল যে চিত্রনাট্যের দিকে তাকালেই রাগ হতো। তবু মনে মনে ভাবতাম, কিভাবে সংলাপ কাট-ছাঁটা করা যায় বা ডিটেলসের দিকে নজর দেওয়া যায়।

শ্রীরায় প্রচণ্ড দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়ে ছবিটি শেষ করেন। 'পথের পাঁচালী'র পরে সত্যজিৎ এরই পরিপূরক হিসাবে 'অপরাজিত' আর 'অপুর সংসার' তুললেন। এই তিনটি ছবিতে যে কাব্যিক জৌলুষ ও চিত্রকল্পজনিত সৌন্দর্য রয়েছে তার সঙ্গে এপর্যন্ত নির্মিত কেবলমাত্র ডনসকয়-এর ম্যাকসিম গোর্কির ট্রিলজিরই তুলনা চলে।

'পথের পাঁচালী'র পটভূমিকা গ্রাম-বাংলা। যার কোলে ছোট্ট অপু আর তার বোন মানুষ হতে থাকে। তাদের বাবা একজন কেরানী, যার মধ্যে কবি হবার সুপ্ত বাসনা রয়েছে। আর মা প্রতিনিয়ত দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে চলেছেন। কাশবনের মধ্য দিয়ে অপু আর তার বোন ট্রেন দেখবার জন্যে ছুটে যায়। এই যে ট্রেনের সঙ্গে অপুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা মোটিভ হিসাবে সত্যজিৎ পরবর্তী খণ্ডতেও ব্যবহার করেছেন। অপু তার বউকে নিয়ে রেললাইনের ধারের ঘরে থাকে, বউ-এর মৃত্যু সংবাদও শোনে সেখানেই, সেইখানেই আত্মহত্যা করতে আসে। রেলপথ আর নদী একই সঙ্গে গতি আর অনুপাতের পরিমাপক। শোনা যায় ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো 'পথের পাঁচালী' দেখতে গিয়ে কিছুক্ষণ পরেই চলে যান। ভারতীয় কৃষকদের ওপর নির্মিত কোন ছবি দেখবার মত স্পৃহা তাঁর নেই। লণ্ডনের জনৈক সমালোচক লিখেছেন, 'চারিদিকে ধান, ধান আর ধানগাছ।' কিন্তু রায় যে একজন প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রেনোয়ার মত তিনিও দেখেন, বার বার দেখেন, তারপর কঠিন দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে ছবি তৈরী করেন। তাঁর ছবির অভিনেতারা (বেশীর ভাগই অপেশাদার) অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে অভিনয় করেন আর সেই জন্যেই এত স্বতঃস্ফূর্ত লাগে। রায় নিজে কৃষক নন এবং ছবিতে যে কাঙ্ক্ষিত ভঙ্গী ফুটে উঠেছে তাও হঠাৎ তৈরী হয় নি।

মানবজীবনের জটিলতার কথা ধরা যাক। 'জলসাঘর'এর বৃদ্ধ জমিদার, যিনি নিজের জীবনের চেয়েও সঙ্গীতকে বেশী ভালবাসেন। অথবা 'দুই কন্যার' তরুণ কেরানী যেন ই এম ফর্স্টারের লেখার নায়ক। রাত্রিতে অপুর কবিতা আবৃত্তি। রায় নিখুঁতভাবে জানেন যে ছবিতে ব্যঞ্জনার জন্য কতখানি আবেগ দরকার। শোনা যাচ্ছে তিনি ফর্স্টারের 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' বইটি ছবি করবেন।

চারিদিকে যখন নিও-রিয়ালিজমের ছড়াছড়ি তখন রায়ই ছবিতে মানবিকতা-সম্পন্ন পুনরুজ্জীবন এনেছেন। যদিও 'পথের পাঁচালী'তে সার্বজনীন ট্রিটমেন্ট আছে, কিন্তু তাঁর পরের ছবিগুলি বেশ জটিল। 'জলসাঘর'এর জমিদার, যিনি নিজে স্বার্থপর কূটিল, কিন্তু সৌন্দর্যের পূজারী। নিজের হৃতসর্বস্ব জমিদারী, একটি মাত্র হাতীর জমিতে পদচারণা যেন আগামী দিনের জমিদারের কাছে হাস্যাস্পদ হয়ে পড়ে। আর লরিগুলো বিকট শব্দ করে যান্ত্রিক সভ্যতার জয় ঘোষণা করে রাস্তার ওপর দিয়ে চলে যায়।

রায়ের নায়করা ব্যর্থ কবি, আনকোরা লেখক, ছাত্র, কিছু লোক যাঁরা নিজেদের জগতে বাস করেন, ('কাঞ্চনজঙ্ঘা') ইংরেজীতে পরিহাস করতে ভালবাসেন। যাঁদের স্বপ্ন হল একমাত্র টাকা, ক্রিকেট সম্পর্কে আলোচনা করতে তাঁরা আগ্রহী। আবার সমান্তরাল আঙ্গিকেও তিনি ছবির নানান দিক তুলে ধরেছেন। যেমন লরি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাছে কুঠারাঘাত।

এখন শ্রীরায় নিজে বাংলাদেশে থাকেন। তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠছে তরুণ পরিচালক গোষ্ঠী। যতদিন না অন্য কোন পরিচালক আসছেন, সত্যজিৎ রায়ই বাংলাদেশে ভারতীয় সিনেমার একমাত্র পুরোধা হিসাবে পরিগণিত হবেন।

রবীন্দ্রনাথ

জে লেডা

সত্যজিৎ রায় নিছক তথ্য ও প্রচার মূলক ছবিতেও তাঁর মহান প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন; তাঁর প্রায় এক ঘণ্টার একটি তথ্যচিত্র 'রবীন্দ্রনাথ' দেখে আমার একথা মনে হয়েছে। রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকীতে তোলা রবীন্দ্র জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা, তারিখ, তাঁর গৃহের পরিবেশ—সমস্ত কিছুকে নিয়ে এমন নিপুণ রবীন্দ্র জীবন-দর্শনের গ্রন্থনা যে আমার মতো মানুষও অল্প সময়ের মধ্যে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্র জীবন-দর্শন সম্পর্কে আমার একটা স্পষ্ট ধারণা হয়েছে। চলচ্চিত্রের একটা নিজস্ব ভাষা আছে এবং সাহিত্যের সঙ্গে তার একটা মৌল পার্থক্যও আছে। কিন্তু সত্যজিৎ রায় যে কত দক্ষ পরিচালক, তার প্রমাণ রবীন্দ্র-মানসের সমস্ত ভাবনা ও তাঁর জীবন-দর্শনকে সম্পূর্ণভাবে ভাষান্তরিত করেছেন চলচ্চিত্রে। সূক্ষ্ম কয়েকটি আঁচড়ে যেন জন্ম হয়েছে একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর ছবির। কোথাও কোন অতি-রঞ্জন, অসঙ্গতি কিংবা কোন উচ্ছ্বাস নেই।

১৯৫৬ সালে চীনের বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত সাহিত্যিক লু সনের জীবন নিয়ে একটি তথ্যচিত্র তোলা হয়; যদিও তিনি ১৯৩৬ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন কিন্তু পূর্বে তাঁকে নিয়ে কোন ছবি তোলা হয় নি (অবশ্য সংবাদ-চিত্রে তাঁর শোকযাত্রার কিছু কিছু দৃশ্য দেখানো হয়েছিলো)। সত্যজিৎ রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ' কিন্তু এসব ছবি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের ছবি। পৃথিবীর বিশ দশক ও তিরিশ দশকের বিক্ষুব্ধ পৃথিবীকে সংবাদ হিসাবে দেখানো হয়েছে উভয় ছবিতে। কিছু কিছু নাটকীয় ঘটনা যদিও দুই ছবিতে প্রায় এক, কিন্তু জাতে আলাদা। যেমন লু সুনের তথ্যচিত্রে মৃত্যুর দৃশ্য যেখানে চিরাচরিত প্রথায় সাংহাই গোরস্থানকে দেখিয়ে সংবাদ চিত্রের মতো শেষ করা হয়েছে, সেখানে রবীন্দ্র প্রয়াণ দেখানো হয়েছে এক অপূরণীয় বেদনার আর্তির মধ্যে, শোকমগ্ন কলকাতাবাসীর শবযাত্রার দৃশ্য দিয়ে। সেখানে আবহ সঙ্গীত, কথা—সমস্ত কিছু যেন একাত্ম হয়েছে ভাবের সঙ্গে।

তাছাড়া রবীন্দ্র জীবন-চিত্রের মধ্যে এমন অনেক ঘটনার অবতারণা হয়েছে, যা তদানীন্তন রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই সব বিষয় কখনো সংবাদ-চিত্রের মাধ্যমে কিংবা কখনো ফোটোগ্রাফ দিয়ে দেখানো হয়েছে, যেমন ১৯১৯ সালে সেই কৃষ্ণ রবিবার, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর পশুশক্তির বর্বর আক্রমণ, মেসিনগানের মুখে নিরস্ত্র জনগণ, শান্তির ললিত বাণীকে ধিকৃত

সত্যজিৎ রায়, ক্লেয়ার ব্লুম ও রড স্টাইগার





সত্যজিৎ রায়, লিণ্ডসে অ্যাণ্ডারসন, মিসেস কাওয়াকিতা

করা অথবা গান্ধীর সঙ্গে সম্পর্ক।

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে মর্মাহত রবীন্দ্রনাথ, 'সভ্যতার সংকট' লিখে পাশবিক শক্তির আগ্রাসী মুখে বিপন্ন মানব সভ্যতাকে রবীন্দ্রনাথ যে অভয়-বাণী দিচ্ছেন এমন বহু উদ্দীপ্ত প্রেরণা-দৃশ্য দেখে বিস্মিত হতে হয়। তথ্যচিত্রের ইতিহাসে সত্যজিৎ রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ'-এর মতো ছবি ইতিপূর্বে কখনো হয় নি। শিল্পস্রষ্টা হিসাবে সত্যজিৎ যে কত গভীর ও মহান তার একটা নিঃসংশয় প্রমাণ রেখে গেলেন এ ছবিতে।

আঙ্গিক-কুশলতা ও বিষয়-সচেতনতা না থাকলে এ সৃষ্টি সম্ভব নয়; সত্যজিৎ এ দুটির অধিকারী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সত্যজিতের সপ্তম ছবি ও প্রথম পূর্ণাঙ্গ দলিল চিত্র। অত্যন্ত সামান্য বিষয়বস্তু থেকে সত্যজিৎ যে কীভাবে এক বৃহদাকার শিল্প উপস্থিত করতে পারেন, 'রবীন্দ্র-নাথ' তারই প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের জীবনীকে চিত্রময় করার জন্যে সত্যজিৎ যেগুলি ব্যবহার করেছেন, সেগুলি হোলো, পুরনো ছবি, পাণ্ডুলিপি, চিঠি, বইয়ের প্রথম পাতা ও রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে আঁকা ছবি। সঙ্গে আছে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যের শট। ছবিটা দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হয় যেন পুরনো কোনো এ্যালবাম জীবন্ত হয়ে উঠছে।

প্রথমেই দেখা গেলো রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ, শ্মশানঘাটের দিকে মিছিল এগোচ্ছে আর সেই সঙ্গে দুই শতাব্দীর ঠাকুর পরিবারের ইতিহাস ক্রমশ প্রকাশ্য হতে হতে রবীন্দ্রনাথের বহু বিচিত্র প্রতিভার উজ্জ্বলন্ত আভাস দেখিয়ে চলেছে।

এক ঘণ্টার মধ্যেই যেন সমগ্র দর্শক একাত্ম হয়ে যান রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় সত্যজিতের এই অপূর্ব সৃষ্টি হয়তো কোনোদিনই আমরা দেখতে পাবো না, কেননা ফিল্ম ডিভিসন নিঃসন্দেহে ছবিটিকে কেটে-ছেঁটে ছোটো করে দেবে ব্যবসায়িক স্বার্থে।

সত্যজিতের

পথের পাঁচালী ঃ ১৯৫৫



ত্রিশের বিখ্যাত উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'। পথের পাঁচালীতে সত্যজিৎ মায়াবী শৈশবকে উন্মোচিত করেছেন। এ পর্যন্ত আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত কুইউসিকা, জেরোডি কনডুইট ও লে কোফর্তে, সেন্ট ক্যু, চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শৈশবকে উন্মোচিত করার চেষ্টা করেছেন।

প্রযোজনা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা:সত্যজিৎ রায়। কাহিনী : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণ : সুব্রত মিত্র। শিল্প নির্দেশক : বংশী চন্দ্রগুপ্ত। সঙ্গীত : রবিশঙ্কর। সম্পাদনা : দুলাল দত্ত। ভূমিকালিপি : সর্বজয়া—করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়। হরিহর—কানু বন্দ্যোপাধ্যায়। ইন্দির ঠাকরুণ—চুনীবালা। অপু—পিনাকী সেনগুপ্ত। দুর্গা—উমা দাশগুপ্ত।

কোলরিজ একদা বলেছিলেন, মৌলিকতা না থাকলে কোন নীতিকে প্রশংসা করা যায় না। সত্যজিৎ সম্ভবত এই কারণে রেনোয়াকে পছন্দ করেছিলেন (বর্তমান সংখ্যায় রেনোয়া সম্পর্কে সত্যজিৎ রায়ের লেখাটি দ্রষ্টব্য) 'পথের পাঁচালী' বহুপঠিত এক বাংলা উপন্যাস থেকে গৃহীত হলেও এর চলচ্চিত্রানুবাদ সম্পূর্ণ ও সার্থক। চলচ্চিত্রটির মধ্যে কোথাও অতি নাটকীয়তা নেই, অথবা চিরাচরিত প্রথার আভাস নেই। বলতে গেলে 'পথের পাঁচালী' যতটা না নাটকীয় তার চেয়ে বেশী কাব্যধর্মী। এটা সম্ভব হয়েছে সত্যজিতের নিজস্ব আবেগের জন্যে।

বিদেশী সমালোচকের কথা তুলে বলতে হলে 'পথের পাঁচালী' ছবি করতে গিয়ে সত্যজিৎ তাঁর চরিত্রের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে গিয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি ফ্লেহার্টির সঙ্গে তুলনীয়, 'মোয়ানা' ছবি করতে গিয়ে 'ফ্লেহার্টি পলিনেশিয়ানদের সঙ্গে দীর্ঘকাল বসবাস করেছেন।

'পথের পাঁচালী'তে যাঁদের পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, তাঁরা হচ্ছেন, ডি সিকা, জাভাটিনি, রোজেলিনি। লক্ষ্য করার বিষয়, এই পরিচালকরাও তথাকথিত নাটকীয় প্রথা পুরোপুরি বাদ দিয়েছেন। কথা প্রসঙ্গে বিদেশী পরিচালকদের নাম উল্লেখ করলেও সত্যজিতের মৌলিকতাকে কোনক্রমেই অস্বীকার করার উপায় নেই।



অপরাজিত ঃ ১৯৫৬

'পথের পাঁচালী'র দ্বিতীয় কাহিনী 'অপরাজিত'। ভেনিসে ১৯৫৭ সালে পুরস্কার পেয়েছে। এখান থেকে অপু আর একবার শহরে গেল…

প্রযোজনা : এপিক ফিল্মস্ কলকাতা, পরিচালনা ও চিত্রনাট্য : সত্যজিৎ রায়। চিত্রগ্রহণ : সুব্রত মিত্র। শিল্পনির্দেশক : বংশী চন্দ্রগুপ্ত। সঙ্গীত : রবিশঙ্কর। ভূমিকালিপি : পূর্ববৎ, শুধু বয়স্ক অপু— সমীরণ ঘোষাল।

ছবিটির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব অথবা নাটকীয় ব্যাপার নেই, সারাক্ষণ শুধু জলের কল থেকে টিপটিপ জল, মেঝের ওপর ঝাড়ুর ঘষঘষানি, এবং এরপর অপুর বাবা হরিহরের মৃত্যু। মৃত্যুর মুখ দেখে মায়ের মুখে বোবা যন্ত্রণা, ছেলের মুখে প্রচণ্ড বিষণ্ণতা। সত্যজিৎ দারিদ্র্যকে অন্তরূপে দেখেছেন, তিনি যেন খুব সহজভাবে বলতে চেয়েছেন, আমরা এইভাবে বেঁচে থাকি, আমরা এইভাবে মারা যাই। তবুও আমরা চিন্তা করি মৃত্যু সম্পর্কে ও মানুষের নিঃসঙ্গতা সম্পর্কে। অপুর বাবা মারা যাচ্ছেন, বাইরে দীপাবলীর উজ্জল আলো, শিশুর কোলাহল। অপুর বাবার মুখটা যেন অন্ধকারে আস্তে আস্তে মন্দিরের প্রার্থনার সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছে। শব্দহীন নৈঃশব্দ্যের মধ্যে সত্যজিৎ যেন আমাদের দিকে চেয়ে দুর্বলভাবে হাসেন, যে হাসি দুঃখের চেয়েও করুণ। 'পথের পাঁচালী'র সিল্যুট ট্রেন 'অপরাজিতে' একটি জমাট বাধা রূপকের মতো হয়ে গেছে।



পরশ পাথর : ১৯৫৭ –'৫৮

হঠাৎ এক সন্ধ্যায়, মাঝবয়সী একজন ব্যাঙ্কের কেরানী পরশ পাথর কুড়িয়ে পেলেন, বিবেকের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই। ভদ্রলোক ঠিক করলেন সারা জীবনে তিনি যা কিছু হারিয়েছেন 'পরশ পাথরে'র দৌলতে সব তিনি ফিরিয়ে নেবেন এবার। চার বছরের মধ্যে ভদ্রলোক বেশ একজন হোমরা-চোমরা হয়ে গেলেন, কিন্তু মুশকিল হলো একটি ককটেল পার্টিতে গিয়ে। জীবনে প্রথম মদ্যপান—ভদ্রলোক বেসামাল হয়ে 'পরশ পাথর'-এর গোপন তত্ত্ব প্রকাশ করে ফেললেন…

প্রযোজনা : এল বি ফিল্মস ইন্টারন্যাশনাল। পরিচালনা ও চিত্রনাট্য : সত্যজিৎ রায়। কাহিনী : পরশুরাম। চিত্রগ্রহণ : সুব্রত মিত্র। শিল্পনির্দেশক : বংশী চন্দ্রগুপ্ত। সম্পাদনা : দুলাল দত্ত। ভূমিকালিপি : তুলসী চক্রবর্তী, রাণী চক্রবর্তী।

'পরশ পাথর' সম্ভবতঃ সত্যজিৎ রায়ের সবচেয়ে অবহেলিত ছবি। ছবিটিতে যে ধরনের প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত তা হয় নি, এর জন্যে দায়ী কয়েকটি কারণ, (ক) কমেডির সীমিত অবদান (খ) সীমিত সময় ও স্থান (গ) পরিহাসগুলিকে আঞ্চলিক ভাষান্তরের অসুবিধা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, কমিক আর্টিস্ট হিসাবে চার্লি চ্যাপলিন স্বীকৃত হয়েছেন তখনই যখন তিনি আঞ্চলিক ভাষা ও গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। চ্যাপলিনের সর্বজনীনতা এখানে অনুপস্থিত, বলা যেতে পারে, 'পরশ পাথর' ফ্যানটাসিভিত্তিক ব্যঙ্গনাট্য। ডি সিকা 'মিরাকল অফ মিলান'-এ ফ্যানটাসি ও বাস্তববাদকে একসঙ্গে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু 'পরশ পাথর'-এর ফ্যানটাসিকে বিশ্বাস করতে হলে হ্যামলেটের বিখ্যাত উক্তিটি মনে করতে হবে, 'দেয়ার আর মেনি থিংকস…'।

'পরশ পাথর'-এর গল্প বলার ভঙ্গি 'মডার্ণ টাইমস-এর' চ্যাপলিনকে ও মিলানের ক্লেয়ারকে মনে পড়িয়ে দেয় বার বার। 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' ও 'জলসাঘর'-এ সত্যজিৎ যে অনিঃশেষ সৌন্দর্যের জন্ম দিয়েছেন তারই একটি ধারালো অংশ 'পরশ পাথর'-এ উপস্থিত। এখানে তুলসী চক্রবর্তীর কথাও মনে আসে, এযাবৎ বাংলা ছবিতে তুলসী চক্রবর্তীর মতো প্রতিভাবান অভিনেতাকে একটি চিরকালীন ভাঁড় সাজিয়ে রাখা হয়েছিলো। একমাত্র 'পরশ পাথর'-এ জানা গেলো তিনি কত বড় শক্তিশালী অভিনেতা ছিলেন।



জলসাঘর ঃ ১৯৫৮



ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের শেষ একটি মানুষকে নিয়ে এ কাহিনীর সূচনা। পুরোনো দিনের ক্ষয়িষ্ণুতার প্রতিনিধিত্ব তিনি করছেন, একদিকে অর্থকষ্ট, অন্য দিকে প্রচণ্ড ঝড়ে নৌকাডুবিতে একমাত্র সন্তানের মৃত্যু। শুধুমাত্র সঙ্গীত-প্রীতির জন্য তিনি বেঁচে রইলেন। পুরোনো অট্টালিকার ছায়া এবং শব্দ তাকে ক্রমশ আহত করে তুললো। পুরোনো জীবনটা ধীরে ধীরে যেন অদৃশ্য হয়ে গেল…

প্রযোজনা : সত্যজিৎ রায় প্রোডাকশন। পরিচালনা ও চিত্রনাট্য : সত্যজিৎ রায়। কাহিনী : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণ : সুব্রত মিত্র। শিল্প নির্দেশনা :. বংশী চন্দ্রগুপ্ত। সঙ্গীত : ওস্তাদ বিলায়েৎ খান। সম্পাদনা : দুলাল দত্ত। বাদ্যযন্ত্রী ও নর্তকী : বেগম আখতার, রোশনকুমারী, ওস্তাদ ওয়াহিদ খান ও বিস্মিল্লা খান। প্রধান চরিত্র বিশ্বম্ভর রায়—ছবি বিশ্বাস।

মনতাজের টেকনিকে দুটিমাত্র যুগ শট নিয়ে কোনো মুড অথবা আবেগ এ পর্যন্ত আর কোনো ছবিতে সম্ভব হয় নি যা 'জলসাঘর'-এ সম্ভব হয়েছে। জলসাঘরের ভেতরে ওস্তাদ গান গাইছেন, বাইরে ইন্টারকাট করা সাদা আলোয় আকাশ ভর্তি হয়ে গেল—এই ধরনের আঙ্গিক খুবই দুর্লভ। সত্যজিৎ শব্দেরও প্রয়োগ করেছেন নানা ভাবে। (হ্রেষা ধ্বনির সঙ্গে শানাইয়ের সুরমূর্ছনা যেন অনেকগুলো অতীতের স্বপ্নে গ্রথিত হয়ে গেছে নিমেষের মধ্যে।

কুশন মোড়া চেয়ারের ওপর একটা মরা মুখ যেন এমব্রয়ডারী করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুখের ধূসর ছায়া পাথরের ছায়ার সঙ্গে একাকার হয়ে যায়, আমরা সারাক্ষণ তাকিয়ে থাকি নিঃসঙ্গ মৃত সেই মুখের দিকে। আর হঠাৎ দেখি সেই ঠোঁট দুটো নড়ে উঠেছে, মুহূর্তের মধ্যে আমরা বিষণ্ণ বিস্ময় অনুভব করি—মৃতবস্তু জীবন ফিরে পাচ্ছে এবং কথা বলার চেষ্টা করছে। আমাদের বিস্মিত চেতনা আরও সজাগ হয়ে ওঠে। যখন দেখি জীবন্মৃত মানুষটি ক্রমশই বেঁচে উঠছে।

ছবিটির মধ্যে একটি অদ্ভুত ধরনের সৌন্দর্য আছে। পুরোনো ঘর, পুরোনো কার্পেট, পুরোনো কাঁচ, পুরোনো মদ, পুরোনো মানুষ আর পুরোনো গান। মানুষটা এইভাবেই বেঁচেছিল এবং 'জলসাঘর'এর মধ্যে দেখা যায় মানুষটি দুমড়ে মুচড়ে এখনও বেঁচে আছে। শুধু কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির জন্যে। সিঁড়ির দিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ আমাদের নজরে পড়ে নিঃসঙ্গ এক টুকরো পাথর, ধুলোপড়া ঝাড়লণ্ঠন, গুটানো কার্পেট, আর এর মধ্যে দিয়েই অদ্ভুত নিঃসঙ্গতার চূড়ান্ত মুহূর্তটি বেরিয়ে আসে। যে নিঃসঙ্গতা সব শিল্পের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে আর যে নিঃশব্দতা নন্দনতত্ত্বের মূল কারণ।

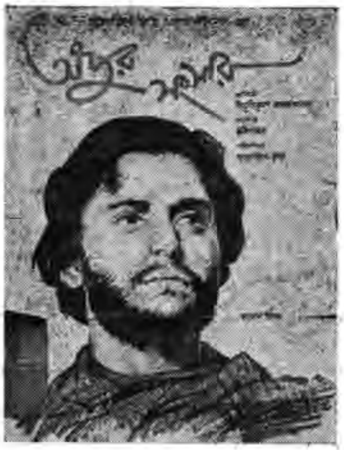
ক্ষয়িষ্ণু জমিদারের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস যেন নতুন করে বেঁচে উঠেছেন। আপাতবিরোধী এই চরিত্রটি ছবি বিশ্বাস সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ছবিটির শেষ দিক অত্যন্ত করুণ এবং সত্যজিৎ হয়ত সঙ্গত কারণেই অস্পষ্ট। 'জলসাঘর'এর ট্র্যাজেডি গর্বের ট্র্যাজেডি। কেননা নায়ক সময়জনিত পরিবর্তন মেনে নিতে পারেন নি। এই পরিবর্তনই তাকে ধ্বংস করে দিল। বার্গম্যান ও পাবস্টের মত সত্যজিতের প্রতীক কখনই জোর করে চাপানো নয়।

পরাজিত আভিজাত্যের জীবনদর্শনে 'জলসাঘর'কে ক্ল্যাসিক পর্যায়ে ফেলা হবে কী না তা ইতিহাস নির্ধারণ করে দেবে।



অপুর সংসার ঃ ১৯৫৯



ত্রয়ী ছবির শেষ ছবি অপুর সংসার। অনেকের মতে তিনটের মধ্যে এইটেই শ্রেষ্ঠ ছবি। এখানে দেখা যায়, যুবক অপু বিয়ে করেছে, প্রথম উপন্যাস লিখেছে, তারপর স্ত্রীকে হারিয়েছে সন্তান জন্মাবার সময়। দেখা যায় অপুর ট্র্যাজেডি এক জায়গায় এসে দানা বেঁধে যাচ্ছে। উপন্যাসের পাতাগুলো পাহাড় গড়িয়ে উড়ে গেল, ভোরের উজ্জ্বল আলো, সঙ্গীতের অবর্ণনীয় কারুণ্য, অপু ভবিষ্যতের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালো। ত্রয়ী গল্প শেষ। অপুর হাতে কাজল, ঠিক অপু যেভাবে ইন্দির ঠাকুরুণের হাতে দোল খেত···

প্রযোজনা: সত্যজিৎ রায় প্রোডাকশন্স। কাহিনী: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণ: সুব্রত মিত্র। শিল্প নির্দেশনা: বংশী চন্দ্রগুপ্ত। সঙ্গীত: রবিশঙ্কর। সম্পাদনা দুলাল দত্ত। প্রধান ভূমিকায়: অপু—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা—শর্মিলা ঠাকুর।

অনেকে অনিবার্যভাবেই মনে করেন 'অপুর সংসার'কে নাকি আলাদা করে দেখা চলে না। কথাটা ঠিক নয়, কেননা আন্তর্জাতিক বহু সমালোচকের মতে ছবিটিকে স্বতন্ত্র ছবি হিসেবেও দেখা চলে। সত্যজিতের সমস্ত চরিত্রের মধ্যে অপু এমন একজন, যার সঙ্গে দর্শক ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতা অনুভব করেন। দুরন্ত শৈশব থেকে ট্র্যাজিক ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে অপু চরিত্রের শেষ বিবর্তন আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে 'অপুর সংসারে'ই। পিতা-পুত্রের অত্যন্ত পরিচিত জগৎ মুহূর্তেই আমাদের চোখের ওপর ভেসে ওঠে।

'অপুর সংসার' যদিও সীমিত ঘটনা-নির্ভর, তবুও ছবিটির মধ্যে মৌলিক আবেগ আছে। অ-রোমান্টিক নেপথ্য থেকে বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়া এবং সেই সঙ্গে কবিতার পৃথিবী থেকে অচেতন গভীরে ডুবে যাওয়া, এই বিবর্তনই বোধহয় দর্শককে বিচলিত করে তোলে।

সত্যজিতের সমস্ত চরিত্রই বাস্তবানুগ। কিন্তু এই বাস্তবানুগতার মধ্যেও এমন এক নৈর্ব্যক্তিকতা, নিরপেক্ষ ভাষণ আছে, যাতে দর্শককে মুহূর্তের মধ্যেই 'ক্যাথারটিক' করে তোলে। অপুকে কোনো মতেই একটি উচ্চকিত চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। কাজেই অপু কোলাহল, ব্যর্থতার মধ্যেও কোমল, আর্দ্র। এক মুহূর্তের আবেগ-শূন্যতা থেকে পরমুহূর্তের আবেগশূন্যতায় পৌঁছলে অনিবার্য একটা ভীতি আমাদের যেন বিচলিত করে তোলে। অপুর পৃথিবীর ভারসাম্যতা কিছু সময়ের জন্যে সম্ভব হয়েছিল অপর্ণার আগমনে। অপর্ণার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অপুর পরিচিত পৃথিবী ধূলিসাৎ হয়ে গেল। অপুর পুরোনো পৃথিবীকে প্রত্যাখ্যান, বাস্তবের মূল্যবোধ ও চেতনা অপুকে যেন আরো অনেক কাছাকাছি পৌঁছে দিল আমাদের। 'অপুর সংসার'কে চিরচরিত প্রথায় ইতরভাবে দেখাতেও কোন বাধা ছিলো না, কিন্তু তাতে শিল্পবোধ আহত হোতো।

মার্সেল ক্রেনের চরিত্রের মতো চকচকে নৈরাজ্যে অথবা ভাগ্যের ক্রশ কারেন্টে অপু কিন্তু তলিয়ে গেল না। নিঃসীম এক ট্র্যাজেডির মতোই 'অপুর সংসার' আরো সহজ, আরো স্বাভাবিক হয়ে উঠলো। মিথ থেকে বাস্তবতা—এইটাই সম্ভবত পথের পাঁচালী।



দেবী ঃ ১৯৬০

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের একটি ভারতীয় তরুণী বধূকে কেন্দ্র করে 'দেবী'র কাহিনী। একদিন তার শ্বশুর স্বপ্ন দেখলেন এবং বিশ্বাস করলেন তাঁর পুত্রবধূ আসলে নারীরূপে কালীমাতা। প্রথম দিকে বিশ্বাস না করলেও একটু একটু করে বধূটিও তাই বিশ্বাস করতে লাগল। তার স্বামী এই অলৌকিক বিশ্বাস থেকে তাকে মুক্ত করতে চেয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে রক্ষা করতে পারে নি। এই ছবিতে সত্যজিৎ রায়ের স্টাইল রীতিমত নাটকীয়, তিনি ধর্মীয় উন্মাদনা ও কুসংস্কারের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছেন।

প্রযোজনা: সত্যজিৎ রায় প্রোডাকসন্স। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা: সত্যজিৎ রায়। মূল কাহিনী: প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। আলোকচিত্র: সুব্রত মিত্র। শিল্পনির্দেশনা: বংশী চন্দ্রগুপ্ত। সঙ্গীত: আলি আকবর খান। সম্পাদনা: দুলাল দত্ত। প্রধান ভূমিকায়: কালীকিংকর—ছবি বিশ্বাস, দয়াময়ী—শর্মিলা ঠাকুর, উমাপ্রসাদ—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

'দেবী'র কাহিনী 'পথের পাঁচালী'র মত প্রাণবন্ত, 'অপুর সংসারে'-এর মত আত্মমুখী, 'মহানগর'-এর মত সমসাময়িক নয়, কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত এবং নতুন ধরনের। নিছক বৈজ্ঞানিক মত ও কুসংস্কারের দ্বন্দ্ব দেখাবার জন্যে এ ছবি নয়।

একটি ব্যক্তিগত পারিবারিক সম্পর্কে তিনি অসাধারণ নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে, আধিদৈবিক কোনও রকম জল্পনা-কল্পনা না করেই, নিজের ধ্যান-ধারণাকে জোর করে চাপিয়ে না দিয়েই, প্রকাশ করতে পেরেছেন। কোন ক্ষেত্রেই তিনি জেনারালাইজ করেন নি। তাই 'দেবী' শ' বা ইবসেনের লেখা সামাজিক নাটকের মত শুধু আইডিয়া-বহনকারী কাহিনী হয় নি। জীবন্ত মানুষগুলিকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। দয়াময়ী নিজেকে রক্তমাংসের মানুষ বলে জানে, তাই শ্বশুরের স্বপ্নদর্শনের কাহিনী তার কাছে অলীক বলে মনে হয়, ফলে অজস্র অন্তর্দ্বন্দ্ব তার মধ্যে, তবু শেষ পর্যন্ত তার প্রতি ভক্তির উপচার সে অগ্রাহ্য করতে পারে না। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত উমাপ্রসাদ তার ঈশ্বরোপনাকে ব্যঙ্গ করে, তবু স্ত্রীকে সে ফেরাতে পারে না। পিতার বিশ্বাস ও স্ত্রীর আচ্ছন্নতা একাকার হয়ে যায়।

যে দৃশ্যে শ্বশুর কালীকিংকর দেবীজ্ঞানে দয়াময়ীকে প্রণাম করছে এবং সঙ্কুচিত দয়াময়ীকে যেভাবে সেই স্পর্শ থেকে দূরে সরতে চাইছে সেটি এই চিত্রে একটি অভিনব সম্পদ। এর পর থেকেই স্বামী এবং বালক পুত্রের মধ্যে থেকেও দয়াময়ী স্বেচ্ছানির্বাসিতা।

সত্যজিতের চোখে দয়াময়ী নারী নয়, যৌবন ও সারল্যের মূর্ত প্রতীক। এই সারল্য তাকে স্বামীর সঙ্গে কলকাতায় চলে যেতে দেয় নি, বার বার সে তার শ্বশুরের স্বপ্নের জালে জড়িয়ে পড়েছে। গ্রীক নায়কদের মত ভাগ্য তাকে লাঞ্ছনা করেছে. তাই পরিণতি স্বাভাবিকভাবেই ট্র্যাজিক।

এ ছবির টেকনিক্যাল দিক নিখুঁত, সম্ভবত তখনও পর্যন্ত সত্যজিতের শিল্পকর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আবহাওয়া সৃষ্টির নৈপুণ্যে তিনি এখানে 'জলসাঘরকে'ও ছাপিয়ে গেছেন। আলোকসম্পাত ও দৃশ্যসংস্থাপনে তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা মুহূর্মুহূ দৃশ্যগত সৌন্দর্যকে প্রকাশ করেছে। দর্শক শেষ পর্যন্ত 'দেবী'র ট্র্যাজিক পরিণতিতে ব্যক্তিগত বিষাদ অনুভব করে না, সব মিলিয়ে আসন্ন-পরিবর্তন বাংলাদেশের একটি বিশেষ যুগমানসকেই যেন প্রত্যক্ষ করতে পারে।



রবীন্দ্রনাথ : ১৯৬১

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারত সরকারের উদ্যোগে এই তথ্য-চিত্রটি নির্মিত হয়। নানা তথ্য, ছবি ও প্রয়োজনে অভিনেতাদের সাহায্যে রবীন্দ্রজীবনী অত্যন্ত নির্ভরযোগ্যভাবে পরিচালক পুনর্নির্মাণ করেছেন। শিশু রবীন্দ্রনাথের অংশটি অপুর ট্রিলজির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

প্রযোজনা: ফিল্মস্ ডিভিশান। পরিচালনা, চিত্রনাট্য ও নেপথ্য ভাষণ: সত্যজিৎ রায়। আলোকচিত্র: সৌমেন্দু রায়। শিল্প নির্দেশনা: বংশী চন্দ্রগুপ্ত। সঙ্গীত: জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। সম্পাদনা: দুলাল দত্ত। শিশু রবীন্দ্রনাথের ভূমিকায়: সমীরণ ঘোষাল।

যে রবীন্দ্রনাথ জীবদ্দশাতেই কিংবদন্তী ছিলেন, তাঁর বহুমুখী প্রতিভার উপযোগী অজস্র কর্মকাণ্ডকে সংক্ষিপ্ত চলচ্চিত্রে ধরা খুব সহজ ব্যাপার নয়। এ ছবির ইংরাজি ভাষ্য অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে সত্যজিৎ রায় রচনা করেছেন এবং নিজেই পাঠ করেছেন। পুরোনো ছবির প্রিন্ট থেকে উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতাকে উদ্ধার করতে হয়েছে, সঙ্গীতে এবং দৃশ্যগত ডিটেলে রবীন্দ্র সমসাময়িক কালকে উপস্থাপিত করতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গ্রাম-বাংলাপ্রীতি, তাঁর বর্ষার প্রতি অনুরাগ রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে, মন্তাজের সুনিপুণ ব্যবহারে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষকে নিয়ে ছবি করার একটা বিপদ আছে, পরিচালক অহেতুক ভক্তিবাদে আচ্ছন্ন হতে পারেন, অবাঞ্ছিত ভাবাবেগে আপ্লুত হতে পারেন। এই সমস্যাকে সত্যজিৎ রায় নির্ভয়ে এড়িয়ে গেছেন। ফলে আমরা একটি সহজ, স্বচ্ছন্দ ও তথ্যনিষ্ঠ জীবনীচিত্র পেয়েছি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ রবীন্দ্রনাথকে বড়ো বেশী আঘাত করেছিল এবং তিনি মানসিক দিক থেকে অসীম চাঞ্চল্য অনুভব করেছিলেন। এই অস্থিরতাকে তথ্যচিত্রে যেভাবে প্রকাশ করা হয়েছে তা এককথায় অভিনব। গোটা পর্দা জুড়ে বিধ্বংসী মহাযুদ্ধের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দৃশ্য, দ্রুম-দ্রুম করে ড্রাম বাজছে, এই ছবি ও আবহসঙ্গীতে যুদ্ধের ভয়াবহতা দর্শকের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

এই যুদ্ধ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ মানুষের শুভবুদ্ধির ওপর বিশ্বাস হারান নি, তিনি চেয়েছিলেন পূর্বদিগন্তের দিকে, যেখানে দিনের আলো প্রথম প্রতিভাত হয়। সত্যজিৎ রায় এ ছবি পূর্ব-দিগন্তের আলোর উন্মেষ দিয়েই শেষ করেছেন।

'রবীন্দ্রনাথ' তথ্যচিত্রের সঙ্গীতগ্রহণে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সত্যজিৎ রায়, বিজয়া রায়, অশেষ ব্যানার্জি প্রভৃতি



তিনকন্যা : ১৯৬১



'তিনকন্যা'ও রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীর ফসল। রবীন্দ্রনাথের তিনটি ছোট গল্প অবলম্বনে এ ছবি তৈরী হয়েছে। 'পোস্টমাস্টার' চাকরিসূত্রে গ্রামে আসা একজন আজন্ম শহরবাসী যুবকের সঙ্গে একটি অনাথা সরল গ্রাম্য বালিকার অসম বন্ধুত্বের কাহিনী। 'মণিহারা' অলৌকিক গল্প, এক নিঃসন্তানা রমণীর অলঙ্কারপ্রীতির ও মৃত্যুর পরে আতঙ্কিত স্বামীর কাছে ফিরে আসার কাহিনী। 'সমাপ্তি' কিঞ্চিৎ কৌতুকরসের গল্প, সেক্সপীয়রের 'টেমিং অফ দি শ্রিউ'-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

প্রযোজনা : সত্যজিৎ রায় প্রোডাকসন্স। পরিচালনা, চিত্রনাট্য ও সঙ্গীত : সত্যজিৎ রায়। কাহিনী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আলোকচিত্র : সৌমেন্দু রায়। শিল্প নির্দেশনা : বংশী চন্দ্রগুপ্ত। সম্পাদনা : দুলাল দত্ত। প্রধান ভূমিকায় : (পোস্টমাস্টার) পোস্টমাস্টার—অনিল চট্টোপাধ্যায়। রতন—চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায়। (মণিহারা) ফণিভূষণ—কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। মণিমালিকা—কণিকা মজুমদার। (সমাপ্তি) মৃন্ময়ী—অপর্ণা দাশগুপ্তা। অমূল্য—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

তিনটি ছোট গল্প একসঙ্গে ছবি করার পরিকল্পনা সে সময় যথেষ্ট জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি করেছিলো। 'পরিচয়' পত্রিকাতে প্রশ্ন করা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের এই গল্পত্রয়ীতে চিত্রকার সত্যজিৎ যে স্বাধীনতা নিয়েছেন তা কতখানি সঙ্গত। উত্তরে শ্রীরায় ছোট গল্প অবলম্বনে ছবি করার ব্যাপারে পরিচালকের বিশ্বস্ততা ও স্বাধীনতা সম্পর্কে একটি দীর্ঘ এবং বিশেষজ্ঞ প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর আলোচনা অবশ্য 'চারুলতাতে'ই সীমাবদ্ধ ছিল। 'তিনকন্যা'য় শ্রীরায় যে স্বাধীনতা নিয়েছেন তা যে যথেষ্ট শিল্পসম্মত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।



'মণিহারা'র মূলতঃ দুটি চরিত্র। গল্পে রবীন্দ্রনাথ শুধু বর্ণনা দিয়ে চরিত্র দুটির যে বৈপরীত্য দেখিয়েছেন সত্যজিৎ ছবিতে তা ক্যামেরার ভাষায় অনুবাদ করেছেন। ফণিভূষণের টাকার দরকার পড়ার সময় পর্যন্ত টেনশন গড়ে তুলতে পরিচালক গল্প লেখকের কাছ থেকে কোন সাহায্য পান নি। তখন পর্যন্ত মূল গল্পে এমন কিছু ঘটে নি, যা দৃশ্যগ্রাহ্যভাবে উপস্থাপিত হতে পারে। বর্ণনাবহুল গল্পকে ছবির উপযোগী করে তোলার কৃতিত্ব কম নয়। এতে শ্রীরায় অনন্য কথকতার প্রমাণ রেখেছেন। ভূতের গল্প শোনার ভয়কাতুরে শৈশবে দর্শককে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন।



'পোস্টমাস্টার' সাদামাটা গল্প। মূল গল্পের করুণরসের আবেদনকে পরিচালক সর্বাংশে ছবিতে আমদানি করেন নি, বরং একজন পাগল চরিত্রের মাধ্যমে দর্শককে 'শক' দিয়েছেন। প্রত্যক্ষ পারিপার্শ্বিক থেকে পোস্টমাস্টারের বিচ্ছিন্ন মানসিকতা পরিস্ফুট করার জন্যেই সম্ভবত শ্রীরায় ছবিতে চরিত্রটিকে এনেছেন।

শেষ ছবি 'সমাপ্তি'। লাজুকস্বভাব গ্র্যাজুয়েট অমূল্য মায়ের কথামত কনে দেখতে গেল। এবং সেইখান থেকেই কৌতুকের শুরু। কোন কোন দৃশ্য অবশ্য স্ল্যাপষ্টিক কমেডিধর্মী। গল্পের মৃন্ময়ী অতর্কিতে অপূর্বকে অজস্র চুম্বন দিয়েছিল, ছবিতে তার অনেক আগেই পরিচালক থেমেছেন।



সব মিলিয়ে একের মধ্যে তিন এই 'তিনকন্যা' ছবিতে বিচিত্র রসের সন্ধান দিয়েছেন পরিচালক। দৃশ্য পরিকল্পনা অসাধারণ, আবহসঙ্গীত মর্মস্পর্শী। এই ছবিতে শ্রীরায় আর একবার প্রমাণ করলেন চরিত্রোপযোগী শিল্পী আবিষ্কারে তিনি অদ্বিতীয়।

কাঞ্চনজঙ্ঘা সত্যজিৎ রায়ের প্রথম রঙিন ছবি। সমৃদ্ধ উচ্চবিত্ত একটি পরিবার দার্জিলিংয়ে বেড়াতে গেছে, কুয়াশাবৃত হিমালয়ের পৃষ্ঠপটে সেই পরিসরের মানুষগুলিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন শ্রীরায়। আধুনিক মানুষের জীবন জটিলতাকে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেছেন, লক্ষ্য করেছেন পরিবারের প্রতিটি মানুষের মনও কেমন কুয়াশাচ্ছন্ন; তার পর এক সময় হিমালয়ের কুয়াশা সরে যায়, স্পষ্ট হয় তুষারকিরীটিনী কাঞ্চনজঙ্ঘা, দর্শকও অনুভব করেন চরিত্রগুলি মুক্ত হচ্ছে তাদের সন্দেহ সংশয় ভীরুতা দুর্বলতা থেকে, কেটে যাচ্ছে তাদের গ্লানির কুয়াশা।

প্রযোজনা : এন সি এ প্রোডাকসন্স, চিত্রনাট্য, সঙ্গীত, পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়। আলোকচিত্র : সুব্রত মিত্র। শিল্প নির্দেশনা : বংশী চন্দ্রগুপ্ত। সম্পাদনা : দুলাল দত্ত। প্রধান ভূমিকায় : রায় বাহাদুর ইন্দ্রনাথ—ছবি বিশ্বাস। মনীষা —অলকানন্দা রায়। লাবণ্য—করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়। অশোক—অরুণ মুখোপাধ্যায়।

'কাঞ্চনজঙ্ঘা' গল্প-ছুট কা হি নী, সত্যজিৎ রায়ের নিজের লেখা। সিনেমা গল্পের জন্যে যে একটি নিটোল কাহিনীবৃত্তের প্রয়োজন হয় এমন ধারণার মূলে তিনি আঘাত করেছেন। ভেতরে ভেতরে ভাঙন-ধরা মডার্ণ সোসাইটির বিন্যাসকে এ ছবিতে তিনি বিশ্বাসযোগ্য ভাবে উপস্থাপিত করেছেন, ছোট ছোট সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে।

পরিবারের কর্তা শিল্পপতি রায় বাহাদুর ইন্দ্রনাথ, শিল্পে তাঁর বিরাট সাফল্য, অসফল তিনি মানবিক সম্পর্কে, তাঁর শান্ত নির্বিরোধ স্ত্রী লাবণ্য একদিন আবিষ্কার করলেন স্বামীর ভালবাসা তিনি পান নি, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া হয় নি, বঞ্চনার ক্ষোভ তাঁর হৃদয়ে। তিনি তাই নিজের ছোট মেয়েকে পরামর্শ দিলেন, যাকে মনে ধরে, যাকে ভালবাসো তাকেই বিয়ে করো। বড় মেয়ে বিবাহিত, একটি ছেলে আছে, তবু তার বিয়ে সুখের হয় হয় নি, বিবাহ-বিচ্ছেদও বুঝি আসন্ন। কারণ, বড় মেয়ের গোপন প্রেমের কথা জেনে ফেলেছে তার স্বামী। প্রচণ্ড আক্রোশের সঙ্কটে মুহূর্তে তাদের একমাত্র সন্তান কাছে এল, স্বামী ভাবল, সব ভুলে আর একবার এই বিয়েকেই স্থায়ী করার চেষ্টা করতে ক্ষতি কী! তার মনের কুয়াশার মুক্তি ঘটলো। ছোট মেয়ে পড়েছে দোটানায়—একদিকে বিলেত ফেরৎ সুপ্রতিষ্ঠিত একজন পুরুষ, অন্যদিকে স্বাধীনচেতা উন্নতমনা এক গ্র্যাজুয়েট বেকার যুবক। একজন দিতে পারে সিকিউরিটি, অন্যজন ভালবাসা। কোনটা বড়? সংশয়ে দ্বিধান্বিত এই মেয়েটি।

'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র রঙের বিন্যাস ভারতীয় ছবির পক্ষে অসাধারণ, সম্ভবত অদ্বিতীয়। সঙ্গীত সম্পর্কেও একই কথা। গীর্জার ঘণ্টা, খেলায় মত্ত শিশুদের কোলাহল, পাখির ডাক, সৈন্যদের কুচকাওয়াজের শব্দ, ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ, এককথায় দার্জিলিংয়ের প্রাত্যহিক শব্দগুলিতে আবহ-সঙ্গীত হিসেবে ব্যবহার করে শ্রীরায় বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়া শ্রীরায়ের নিজস্ব একুশখানি খণ্ড সঙ্গীত-রচনা আবহকে সমৃদ্ধ করেছে।



অভিযান ঃ ১৯৬২



একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারের কখনও কৌতুকপ্রদ, কখনও দুঃসাহসিক, কখনও বা রোমান্টিক অভিযানের চিত্ররূপ। ছবির প্রথম দিকে ড্রাইভার যুবকটি আত্মসচেতন, নিরুদ্বেগ ; কিন্তু এক অসাধু ব্যবসায়ী একটি সরল গ্রাম্য যুবতীর সঙ্গে তার প্রণয় স্থায়ী হতে দেয় না, মেয়েটি বারবনিতায় পরিণত হয়। 'অভিযান' চিত্রে সত্যজিৎ রায়ের নিজস্ব সংযত ভঙ্গির চেয়ে জনপ্রিয় ভারতীয় চিত্রের ঐতিহ্যই বেশী অনুসৃত বলে অনেকে অভিযোগ করেছেন।

প্রযোজনা : অভিযাত্রিক। চিত্রনাট্য, সঙ্গীত ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়। মূল কাহিনী: তারাশঙ্কর। আলোকচিত্র: সৌমেন্দু রায়। শিল্পনির্দেশক : বংশী চন্দ্রগুপ্ত। সম্পাদনা : দুলাল দত্ত। প্রধান ভূমিকায় : নরসিং—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। গুলাবী : ওয়াহিদা রেহমান।

'অভিযান' ছবিতে দুটি জিনিস খুব স্পষ্ট করে বলেছেন সত্যজিৎ রায়। এক, হতাশায় অবনত একটি পুরুষ এক ধরনের সিনিকাল ইনার্সিয়ায় তলিয়ে গেলে আর তা থেকে উঠে আসতে পারে না। দুই, ধুরন্ধর পাটোয়ার ব্যবসায়ীরা যে মুহূর্তে তার অসাধু ধান্দার উপযোগী শিকার খুঁজে পায় অমনি তার দুর্বলতার সব সুযোগগুলি নিতে সুরু করে।

দুর্নীতিপরায়ণ সমাজের পৃষ্ঠপটে 'অভিযান' এক দুর্ধর্ষ ছবি। নরসিং যখন প্রেমের মুখোমুখি হয় তখন তার প্রতিক্রিয়া যেমন বাস্তব, তেমনি মর্মস্পর্শী। এ সমাজে অসাধুতার জাল বহুদূর বিস্তৃত, অজান্তে সেই জাল ছড়াতে যারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছে তারাও জড়িয়ে যাচ্ছে তাতে, নরসিংয়ের অসহায় পরিণতি খুব স্বাভাবিকভাবে চিত্রিত।

একটি উপকাহিনীতে গ্রামের খ্রীস্টানদের লাঞ্ছনার চিত্র নিষ্ঠার সঙ্গে উপস্থাপিত।

'অভিযান' বক্স-অফিস প্রসন্নতা লাভ করেছিল সম্ভবতঃ উত্তেজক অভিযানমূলক কাহিনী, বক্স-অফিস স্টার কাস্ট ও দৈর্ঘ্যে যোলো রিল বলে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও শ্রীরায়ের জাদুস্পর্শ এ ছবিতেও সমানভাবে উপস্থিত। প্রথম দৃশ্যের সেই কম্পোজিশন, দোকানদারের সঙ্গে তর্কাতর্কি করছে নরসিং, তার ক্রুদ্ধ মুখটা ফাটা আয়নায় প্রতিফলিত, সে কি ভোলবার ? আর সেই উত্তেজক, অথচ কৌতুকপ্রদ দৃশ্যটি—যেখানে নরসিং গাড়িতে ক্রমান্বয়ে স্পিড বাড়াচ্ছে ডেলি প্যাসেঞ্জারদের ট্রেন ধরিয়ে দেবার জন্যে, ভীত সন্ত্রস্ত যাত্রীদের সেই ক্লোজ আপ স্টাডি, ভোলা যায় না।

এ ছবির বড় সম্পদ আবহ-সঙ্গীত। সত্যজিতের সেই রচনা লং প্লেয়িং রেকর্ড-বদ্ধ করে রাখার মত ; ছবিতে যেমন সুপ্রযুক্ত, ছবির থেকে আলাদা করেও শোনার মত।



মহানগর ঃ ১৯৬৩



মহানগর কলকাতা ; কলকাতাই 'মহানগর'-এর ঘটনাস্থল। স্বামী স্ত্রী দুজনেই চাকরি করার আধুনিক প্রয়োজন বা বিলাস মূল কাহিনীর অবলম্বন। মধ্যবিত্ত জীবনকেন্দ্রিক তুচ্ছ কাহিনীতে পরিচালক বিশ্বজনীন মানবিক আবেদন যুক্ত করেছেন। ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টেণ্ট-এর স্ত্রী স্বেচ্ছায় সে ল স গা র্লে র চাকরি নিল, পরিবারে এল নানা জটিলতা, ভুল বোঝাবুঝি, অশান্তি, শেষ পর্যন্ত দুজনকেই দেখি বেকার, তবু জীবনকে তারা মোকাবিলা করতে পারছে আরো সাহসের সঙ্গে নির্ভয়ে, যখন পরস্পর পরস্পরকে বুঝতে পারছে।

প্রযোজক : আর ডি বনশাল। পরিচালনা, চিত্রনাট্য ও সঙ্গীত : সত্যজিৎ রায়। মূল কাহিনী : নরেন্দ্রনাথ মিত্র। আলোকচিত্র : সুব্রত মিত্র। শিল্পনির্দেশনা : বংশী চন্দ্রগুপ্ত। সম্পাদনা : দুলাল দত্ত। প্রধান ভূমিকায় : সুব্রত—অনিলচট্টোপাধ্যায়। আরতি—মাধবী মুখোপাধ্যায়।

শহরবাসী মধ্যবিত্ত জীবনের কাছাকাছি আ সা য় সত্যজিতের প্রথম প্রচেষ্টার ফল 'মহানগর'। এ শুধু কলকাতার গল্প নয়, কলকাতা এখানে গোটা ভারতের সব মহানগরের প্রতিনিধি। গৃহীত পরিবারটিও প্রতিনিধিস্থানীয়। মধ্যবিত্ত-জীবনের যে অস্থিরতা যে সমস্যা এখানে শ্রীরায় দেখিয়েছেন, ভারতীয় শিক্ষিত সব মধ্যবিত্তই তার শরিক। পরিবারের কর্তা, সুব্রতর বাবা, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মানুষ ; ছেলের কোন কিছুই তিনি ভাল চোখে দেখেন না, বিশেষত ছেলে যে তার স্ত্রীর চাকরি পেতে সাহায্য করছে এটা তাঁর চোখে নিতান্তই বাড়াবাড়ি। সুব্রত যে ব্যাঙ্কে চাকরি করত ; সেই ব্যাঙ্ক ফেল করল, সুব্রতরও চাকরি গেল, তখন স্ত্রীর আয়ে সংসার চলে, স্বামী নীরব হীনমন্যতায় ভোগে ; নানা জটিলতা দেখা দেয়।

এডিথ অফিসে আরতির এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সহকর্মী, 'বস' দুর্ব্যবহার করে এডিথের সঙ্গে, তাতে ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হয়ে মুখের ওপর আরতি ছুঁড়ে দেয় তার পদত্যাগপত্র। শ্রীরায় এই পদত্যাগপত্র নিয়েও অভিনব সিচুয়েশনের সৃষ্টি করেছেন, এটাআরতিকেসুব্রত একরকম জোর করে লিখিয়েছিল, কিন্তু ব্যাঙ্ক ফেল করাতে সুব্রত টেলিফোন করে জানাল, ওটা এখন দিয়ে কাজ নেই, আরতির রোজগারেই সংসারে চালাতে হবে ; সেই টেলিফোন পাবার পরেও পদত্যাগপত্র দিল আরতি।

একটা পরিবার অনিবার্য সঙ্কটের মধ্যে পড়ল, কিন্তু একটি দম্পতি ঘনিষ্ঠ হল, দ্বিধা সংশয় ঘুঁচে গেল, জীবনকে সহজভাবে গ্রহণ করার সাহস পেল।

এই ছবিতে মধ্যবিত্ত জীবন যে কী ভীষণভাবে মোড় নিচ্ছে তা আমরা প্রত্যক্ষ করি, লক্ষ্য করি পরিবারের মানুষে-মানুষে সম্পর্কেরকী আমূল পরিবর্তন তলে তলে সংঘটিত হচ্ছে। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে চাকরি করতে বেরুচ্ছে, শাশুড়ি পুত্রবধূর এঁটো কুড়োচ্ছেন, কিশোরী ননদ অফিসের তাড়ায় দ্রুত আহার রত বৌদিকে বলছে, মোচার ঘণ্টটা কিন্তু আমি রেঁধেছি, ইত্যাদির মধ্যে অজস্র ইঙ্গিত আছে, একাধিক অদৃশ্যকে তা প্রত্যক্ষ করায়।



চারুলতা ঃ ১৯৬৪



রবীন্দ্রনাথের ত্রিভুজ-প্রেমের কাহিনী এই গল্পের অবলম্বন। বাংলা একটি সাপ্তাহিক সম্পাদনা করে ভূপতি, সর্বক্ষণ কাজে মেতে আছে। তার স্ত্রী 'চারুলতা'র সব কিছু একঘেয়ে লাগে, সময় মনে হয় বিলম্বিত। ভূপতির এক দূর সম্পর্কের ভাই অমল এল দাদার বাড়িতে। অমল চারুর সাহিত্য-সঙ্গী, একটু একটু করে নতুন একটা সম্পর্ক দাঁড়াল এই দুটি তরুণ-তরুণীর মধ্যে। উনবিংশ শতাব্দীর বড় ঘরের সম্ভ্রান্ত ত্রিভুজ-প্রেমের অনবদ্য চিত্ররূপ।

প্রযোজনা : আর ডি বনশাল। পরিচালনা, চিত্রনাট্য, সঙ্গীত : সত্যজিৎ রায়। মূল কাহিনী : রবীন্দ্রনাথ। আলোকচিত্র : সুব্রত মিত্র। শিল্প-নির্দেশনা : বংশী চন্দ্রগুপ্ত। সম্পাদনা : দুলাল দত্ত। প্রধান ভূমিকায় : চারুলতা—মাধবী মুখোপাধ্যায়। অমল—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। ভূপতি—শৈলেন মুখোপাধ্যায়।

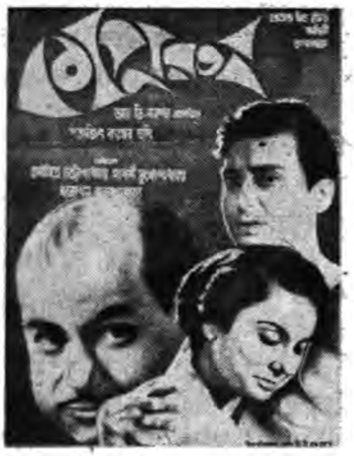
সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনির্মাণের যে ধারার সঙ্গে দর্শক পরিচিত 'চারুলতা' তার অন্তর্ভুক্ত নয়। মুষ্টিমেয় কয়েকটি চরিত্র নিয়ে সেকালের কলকাতার পটভূমিকায় একটি বিরাট গল্প বলেছেন তিনি। এছবিরইঙ্গিতেইঙ্গিতেজটিলতা, কিন্তু খুব স্বচ্ছন্দ ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপিত। কাছের ভূপতিকে অপেরা-গ্লাস দিয়ে দেখার ব্যঞ্জনাময় শটটি বাক্-সংযমের, সত্যজিতের চিত্রভাষা-জ্ঞানের নিঃসংশয় প্রমাণ। আর শেষ দৃশ্যের ফ্রিজ শট। এমন সুপ্রযুক্ত, অর্থময় ফ্রিজ শট ইতিপূর্বে দেখা যায় নি।

রবীন্দ্রনাথের মূল গল্পে যে প্রশান্তি, ছবিতে তা নেই, বরং অস্থিরতা এর আবেগধর্ম; উনবিংশ শতাব্দীর উচ্চ মধ্যবিত্ত নীতি ও বিবেকবোধ সতর্কতার সঙ্গে প্রতিফলিত। গল্পে ভূপতি যেন চারু-অমলের পৃষ্ঠপট মাত্র, কিন্তু এ ছবিতে ভূপতিকে একটি গোটা মানুষ হিসেবে চিত্রণের কৃতিত্ব সত্যজিতের। ছবিতে ইতস্তত আরো এমন কতকগুলি শট ছড়িয়ে আছে, যা এতদিন পরেও যে-কোন মনোযোগী দর্শক স্মরণ করতে পারেন। ভূপতির সামনে বসে অমল তার লেখা পাঠ করছে, ভূপতি অমলের বিয়ের কথা তুললো, মশারীর আরেক দিকে বসে চারুলতা সব শুনলো, ভূপতি যখন কপর্দকহীন তখন নিষ্ক্রিয় ছাপাখানা দেখা যাচ্ছে; বিশ্বাসের মূল্য সম্পর্কে যখন মন্তব্য করছে ভূপতি, তখন পেছনের দিকে চারুলতা নিজেকে গোপন করার চেষ্টা করছে; ছবির এইসব ফ্রেম অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ। এগুলির মধ্যে দিয়েই পরিচালক ঘটনাকে অনিবার্য পরিণতির দিকে নিয়ে গেছেন।

'চারুলতা'র সঙ্গীত এ ছবির একটি অসাধারণ সম্পদ, রবীন্দ্রনাথের গানের সুর ভেঙে পরিচালক শ্রীরায় যে আবহ সৃষ্টি করেছেন, তা অজান্তে দর্শককে অভিভূত করে। এ ছবিতে চারটি সাঙ্গীতিক 'মোটিভ' আছে, একটা চারুলতার নিঃসঙ্গতাকে বোঝাবার জন্যে, দ্বিতীয়টি অমলের কাছে চারুর ভেঙে পড়ার দৃশ্যে, তৃতীয়টি স্কচ সুরের অবলম্বনে রচিত, রবীন্দ্রনাথের 'ফুলে ফলে' গানটিও যার ভিত্তি, চতুর্থ 'মোটিভ' রবীন্দ্রসঙ্গীত-অনুসারী, যদিও পূর্বে অন্যান্য 'মোটিভে'র মিশ্রণে ব্যবহৃত। স্থায়িত্বের দিক থেকে মোট পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সঙ্গীতের মধ্যে মাত্র এগারো মিনিট রবীন্দ্রসঙ্গীত-ভিত্তিক। যে যাই হোক, সব মিলিয়ে আবহাওয়া সৃষ্টির অনন্য প্রতিভার পরিচয় পরিচালক রেখেছেন।



কাপুরুষ ও মহাপুরুষ ঃ ১৯৬৫





দুই ভিন্নধর্মী গল্পের সমাহার। দুটিই বাংলা সাহিত্যের বহুপঠিত ছোট গল্প। মূল গল্পের নাম 'জনৈক কাপুরুষের কাহিনী' ও 'বিরিঞ্চিবাবা'। কাপুরুষ ছবিতে পটভূমি হিমালয়ের পাদদেশে 'চা বাগান' অঞ্চল, বিত্তশালী মদ্যপায়ী 'প্ল্যানটার' একদিন একটি যুবককে তার বাংলোতে নিয়ে তুললো। যুবকটি তার স্ত্রীর প্রাক্তন প্রণয়ী, ছবির ফ্ল্যাশব্যাকে তা দেখানো হয়েছে। একালের উচ্চ-বিত্ত জীবনে বিবাহ সম্বন্ধে ধারণাকে পরিচালক বিশ্লেষণ করেছেন।

কৌতুকধর্মী ছবি 'মহাপুরুষ'-এর জনৈক ভণ্ড বাক-চতুর ধর্ম ব্যবসায়ীর সামাজিক প্রভাব কৃতিত্বের সঙ্গে চিত্রিত। ছবি কৌতুকধর্মী বলেই অতি-কথনের স্বাধীনতা নেওয়া হয়েছে।

প্রযোজনা: আর ডি বনশাল। পরিচালনা, চিত্রনাট্য, সঙ্গীত: সত্যজিৎ রায়। মূল কাহিনী: প্রেমেন্দ্র মিত্র (কাপুরুষ) ও পরশুরাম (মহাপুরুষ)। আলোকচিত্র: সৌমেন্দু রায়। শিল্প নির্দেশনা: বংশী চন্দ্রগুপ্ত। সম্পাদনা:



দুলাল দত্ত। প্রধান ভূমিকা: (কাপুরুষ) সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় (মহাপুরুষ) চারুপ্রকাশ ঘোষ, রবি ঘোষ।

একই সময়ে দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের গল্প নিয়ে ছবি করার দুঃসাহস চলচ্চিত্রে একমাত্র সত্যজিৎ রায়ই দেখাতে পেরেছেন। 'কাপুরুষ'-এ, খানিকটা চিরাচরিত ত্রিভুজ প্রেমের গল্পে পরিচালক অস্বাভাবিক গম্ভীরতা আনতে গেছেন। দর্শক ছবির মাঝপথে এই সংশয়ে আন্দোলিত হন—নায়িকা তার পার্থিব সুখ বিত্ত বৈভব আঁকড়ে ধরবে, না তার প্রাক্তন প্রণয়ীর জন্যে ঘর ছাড়বে! 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র মতো এখানেও সেই সিকিউরিটি ও প্রেমের দ্বন্দ্ব। শেষ দৃশ্যে নায়িকা যখন তার সেই প্রেমিকের কাছে একটু একটু করে এগিয়ে আসেন, মূলগল্পের প্রত্যাশা দর্শককে পেয়ে বসে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত দর্শক অবাক হয়ে দেখেন গল্পের সেই নাটক এখানে নেই, ধীর শান্তভাবে ঘুমের বড়ির শিশিটি শুধু চেয়ে নিয়ে চলে যায়। অর্থাৎ প্রেম থেকে সেই সিকিউরিটিতে প্রত্যাবর্তন। এমন অনাটক নাটকীয়তা খুব কম ছবিতেই এইভাবে তার সমাপ্তি ঘোষণা করে।



'মহাপুরুষ' ব্যঙ্গধর্মী গল্প, গল্পের প্রয়োজনেই পরিচালক তাঁর ভঙ্গি বদলেছেন। অনেকেই এই ছবির আপাত স্থূলতাকে পরিচালকের শৈল্পিক অবনতি বলে ভুল করেছেন; আসলে স্থূলতাটাই এ ছবির অভিপ্রেত বস্তু। ভণ্ড সাধুর কপটাচার, ব্যক্তিপূজা ও ধর্ম উন্মাদনা এগুলি যেহেতু ছবির বিষয়বস্তু, দর্শককে সর্বক্ষণ হাসির মধ্যে না রাখলে গোটা ছবিটাই তাদের পক্ষে গুরুপাক হোত। 'মহাপুরুষ' ছবিতে সত্যজিৎ কয়েকটি টাইপ চরিত্রকে পর্দায় এনেছেন, সমাজতাত্ত্বিকের চোখে তাদের বিশ্লেষণ করেছেন, মনস্তাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে নয়।

আগাগোড়া ভিন্নরসের মহান ছবি, দর্শকরা নিঃসন্দেহে উপভোগ করতে পেরেছেন।

কিছু কিছু টেকনিক্যাল কাজ, টাইটেলও কৌতুকচিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে।

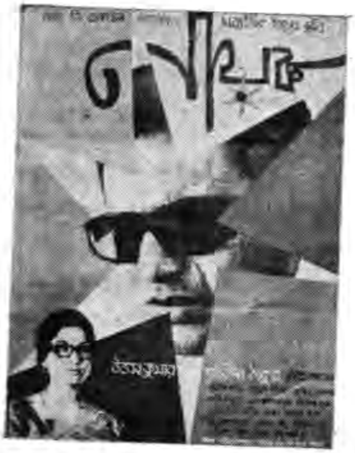
এককথায় ছবির গভীর মননশীলতা পরিচালকের লঘু স্বচ্ছন্দ শিল্প-বিহারের ফলশ্রুতি।

আমরা 'পথের পাঁচালী' আর 'অপরাজিত' দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম, সত্যজিৎ রায়ের মত বিশাল চরিত্র কদাচিৎ দেখা যায়। শৈশবের অপুকে আমরা খুঁজে পাই না, সে অর্থে আমরা বিচ্ছিন্ন। অপু এখন কলকাতার বাসিন্দা। গড্ডালিকা প্রবাহে না ভেসে সে লেখার ওপর ঝোঁক দিয়েছে। বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে তার বিয়ে হয়েছে। অপুর বউ অপর্ণার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমরা আর একটি জগতের সন্ধান পাই।

যদিও ছবিতে একদম নাটুকেপনা নেই একথা বলা মুশকিল, তবুও শ্রীরায়ের নিজস্ব সৃষ্টির যে ছন্দ, তার ব্যতিক্রম এখানে নেই। মানবচরিত্রের নানা দুঃখ আর আশার অপরূপ একটি দিক তিনি অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। ছবিটিতে কোথাও যে একঘেয়েমি অনুভূত হয় নি, তার প্রধান কারণ শ্রীরায়ের কাব্যিক গতি। ছবির মধ্যে তিনি কবিতা লিখেছেন। এক কথায় তিনি সেলুলয়েডের কবি।

[ভবোধি মাস্টারস

নায়ক ঃ ১৯৬৬



পেশাগত সাফল্যের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে এক জনপ্রিয় চিত্রাভিনেতার নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতা উপলব্ধির কাহিনী 'নায়ক'। দিল্লীগামী ভেসটিবুল গাড়ির কামরায় মূল কাহিনী উপস্থাপিত, ইতস্তত ফ্ল্যাশ ব্যাকে ঘটনা বিস্তৃত। 'ট্রেনের কামরায় কয়েকজন সহযাত্রী পার্শ্ব চরিত্র হিসাবে উপস্থিত, নায়কের বিচিত্র মানসিকতা উন্মোচনে পরিচালক তাদের ব্যবহার করেছেন।

প্রযোজনা: আর ডি বনশাল। কাহিনী চিত্রনাট্য, পরিচালনা ও সঙ্গীত: সত্যজিৎ রায়। আলোকচিত্র: সুব্রত মিত্র শিল্প নির্দেশনা: বংশী চন্দ্রগুপ্ত। সম্পাদনা দুলাল দত্ত। প্রধান ভূমিকায়: অরিন্দম—উত্তমকুমার। অদিতি—শর্মিলা ঠাকুর।

'নায়ক' ছবিতে পরিচালক নেপথ্যে থেকেও পর্দার অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছেন। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র পরে সত্যজিৎ আবার নতুন চলচ্চিত্রের কাহিনী লিখলেন, দুটোর মধ্যে সূক্ষ্মভাবে মূলগত মিল আগ্রহী সমালোচকের চোখ এড়িয়ে যাবে না। এখানেও কেন্দ্রীয় চরিত্র বিত্তবান। বিত্ত বৈভব তাকে এমন জগতে নির্বাসিত করেছে, যেখানে অজস্র চমক, কিন্তু সাধারণ মানবিক সম্পর্ক এবং সেই সূত্রে হৃদয়চর্চা শোচনীয়ভাবে অনুপস্থিত। অদিতি সেনগুপ্তা, একটি মহিলা পত্রিকার সম্পাদিকা, আকস্মিকভাবে নায়ক অরিন্দমের কাছাকাছি এসে গেল, টুকরোটাকরা কথার মধ্যে দিয়ে যেন সেই মহিলাকে উপলক্ষ্য করেই নায়ক উন্মোচন করলেন তার অন্তরজীবন, যে জীবন হতাশা, নিঃসঙ্গতা ও আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তর। আসলে এ ছবি নায়কের, সেই উপলক্ষ্যে অনুরূপ বিত্তশালী মানুষের, আত্মসাক্ষাৎকারের কাহিনী।

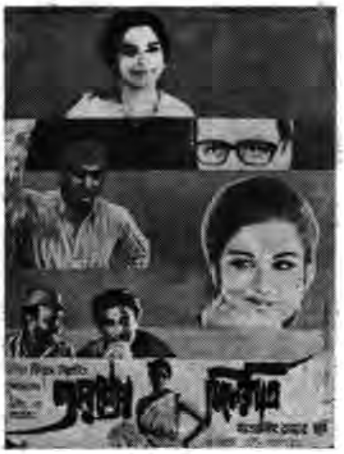
মাত্রাতিরিক্ত 'ফ্ল্যাশব্যাক' কাহিনীর প্রয়োজনেই এসেছে এবং অনেকে এজন্যে ছবিটিকে মন্থর বলে মনে করেছেন। কিন্তু মন্থরতা এ ছবির চরিত্রধর্ম, পরিচালকের সচেতন কারুকৃতি।

যে জীবন নায়কের পক্ষে দুর্বিসহ, সেই জীবন থেকে তার মুক্তি নেই, সাময়িকভাবে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করে আবার তাকে সেই জীবনেই ফিরে যেতে হয়। ছবির সর্বজনীনতা এখানেই।

'নায়ক' ছবির সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ সংলাপ। এমন নাটকীয়তা বর্জিত স্বচ্ছন্দ বাস্তব সংলাপ বাংলা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে নতুন অভিজ্ঞতা।



অরণ্যের দিনরাত্রি ঃ ১৯৬৯



প্রযোজনা : প্রিয়া ফিল্মস। পরিচালনা, চিত্রনাট্য ও সঙ্গীত : সত্যজিৎ রায়। মূল কাহিনী : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। আলোকচিত্র : সৌমেন্দু রায়। শিল্পনির্দেশনা : বংশী চন্দ্রগুপ্ত। সম্পাদনা : দুলাল দত্ত। প্রধান ভূমিকায় : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। শর্মিলা ঠাকুর। সমিত ভঞ্জ। সিমি। রবি ঘোষ। পাহাড়ী সান্যাল। কাবেরী চট্টোপাধ্যায়।

ফরেস্টের ডাকবাংলোয় এসে উঠেছে কলকাতার কয়েকজন অস্থিরচিত্ত যুবক, উদ্দেশ্য কয়েকটা দিন যার-যা-মন-চায় করে কাটিয়ে যাওয়া। সভ্য নাগরিক জীবনের প্রতি ওরা বীতশ্রদ্ধ। সংবাদপত্র পুড়িয়ে নাগরিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ ঘোষণা করার দৃশ্যটি তাৎপর্যপূর্ণ।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচালক ওদের বিশ্লেষণ করেছেন, নির্ভয়ে দেখিয়েছেন ওদের নিষ্প্রেম কামনা, আদিবাসীদের সরল জীবনে ফিরে যাওয়ার সাময়িক আকুতি, দেখিয়েছেন ওদের নেশাগ্রস্ত উন্মত্ত উল্লাস। গাড়ির হেড-লাইটে ওদের বিকৃত নাচের ভঙ্গি দেখিয়ে পরিচালক যেন ওদের জীবনের একটা রেখাচিত্র এঁকেছেন।

অরণ্যবাসে এসে ওরা একটি পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হল। সেখানে আর এক নাটক। বিশেষ সেই স্বামীহীনা সুন্দরী যুবতী বধূটির জীবন। এক গা গয়না পরে হঠাৎ সল্পপরিচিত একটি অনাত্মীয় যুবকের সামনে এসে দাঁড়ানোর মধ্যে তার যে অবদমিত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে তা মর্মন্তুদ।

অরণ্যের আবেষ্টনেও যন্ত্রণা থেকে যে মানুষের মুক্তি নেই, এ ছবির প্রতিটি ফ্রেমে আমরা তা অনুভব করতে পারি।

বলিষ্ঠতা এ ছবির সবচেয়ে বড় গুণ। অন্য কোন স্বল্পশক্তি পরিচালকের হাতে পড়লে যা অশালীন হবার আশংকা ছিল, সত্যজিৎ তাকে অপূর্ব সুষমামণ্ডিতভাবে প্রকাশ করেছেন। প্রথম শ্রেণীর শিল্পের এইটাই প্রাক্‌শর্ত।



সত্যজিৎ রায়ের জীবন-সমীক্ষা কোথাও এসে অতর্কিতে থেমে যায় নি। বাঙালীর জীবন যখন যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানেই তিনি সাগ্রহে উপস্থিত। তিনি অপুকে অনুসরণ করে এসেছেন নিশ্চিন্দিপুর থেকে কলকাতা পর্যন্ত। তারপর আবার সেই পথ অনুসরণ করে গেলেন অরণ্যের এক ডাকবাংলোয়, যেখানে কয়েকজন তরুণ, নির্মম পরিচিত বৃত্ত থেকে পালিয়ে নিরুদ্দেশ আত্মগোপন করেছে।

প্রতিদ্বন্দ্বী ঃ ১৯৭০



দ্রুত পরিবর্তমান কলকাতাকে, তার তারুণ্য যুগমানস ও যন্ত্রণা নিয়ে, সত্যজিৎ রায় নিবিড়ভাবে অনুসরণ করে আসছেন। যৌবনের অস্থিরতা নিয়ে তাঁর প্রথম ছবি 'অরণ্যের দিন-রাত্রি'—'প্রতিদ্বন্দ্বী' তারই পরিপূরক।

প্রযোজনা : প্রিয়া·ফিল্মস। পরিচালনা, চিত্রনাট্য ও সঙ্গীত : সত্যজিৎ রায়। মূল কাহিনী : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। আ লো ক চি ত্র : সৌমেন্দু রায়। শিল্পনির্দেশনা : বংশী চন্দ্রগুপ্ত। সম্পাদনা : দুলাল দত্ত।· প্র ধা ন ভূমিকায় : ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়। জয়শ্রী রায়। কৃষ্ণা বসু। কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়। ভাস্কর চৌধুরী।

'প্রতিদ্বন্দ্বী'র নায়ক সিদ্ধার্থ আধুনিক যুগমানসের প্রতিনিধি। শৈশবে স্বপ্ন ছিলো, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিলো, যখন জীবনের মুখোমুখি হল তখন সে-সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। প্রথম আঘাত বাবার মৃত্যু। ডাক্তারি পড়ছিল সিদ্ধার্থ, সে আর হলো না, পড়াশুনা ছেড়ে তাকে চাকরির সন্ধানে বেরুতে হলো। একের পর এক হৃদয়হীনতার অভিজ্ঞতায় বুকের মধ্যে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল, তাই ফেটে পড়লো ইণ্টারভিউ বোর্ডের সামনে। ওর চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘোরার মধ্যবিত্ত মা ন সি ক তা কে ছোট ভাই টুনু ব্যঙ্গ করে। টুনু বিশ্বাস করে উগ্র রাজনীতির আশ্রয়ে এই সমাজটাকে বদলে দেওয়া যায়। সিদ্ধার্থের অস্থিরতা, সংশয় ও অসহায়তার মধ্যে মাঝে মাঝে অতীত সুখস্মৃতি ভেসে ওঠে, চ ল মা ন জগৎ ও জীবনকে মনে হয় নির্মম অপরাজেয় প্রতিদ্বন্দ্বী।

অসামান্য পরিমিতি বোধে 'প্রতিদ্বন্দ্বী' অনন্য শিল্পকর্ম। একটি পরিচিত পাখির ডাককে পরিচালক এমন প্রতীকী ব্যঞ্জনায় ব্যবহার করেছেন, যা দেখলে বিস্ময়ে বিমূঢ় হতে হয়।



সীমাবদ্ধ ঃ ১৯৭১



এখন পর্যন্ত 'সীমাবদ্ধ'ই সত্যজিতের শেষ ফিচার ফিল্ম। দেরীতে হলেও এমন একটি জগৎ তিনি আমাদের সামনে উন্মোচিত করলেন ব্যক্তিগতভাবে যে জগৎ তাঁর পরিচিত, এ্যাডভার্টাইজমেণ্ট এজেন্সির চাকরি সূত্রে যে জগৎকে তিনি নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়ত পেয়েছেন। উচ্চবেতন ভোগী বিজনেস একজিকিউটিভদের জীবনকে উপলক্ষ্য করে পরিচালক বিত্তশালী জীবনের সীমাবদ্ধতাই নির্দেশ করেছেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষার সোপানগুলি নির্ভুল দ্রুত পদক্ষেপে পেরিয়ে এসে নায়ক দেখল সে নিঃশেষিত, সম্ভবত রিক্তও।

প্রযোজনা : চিত্রাঞ্জলী। চিত্রনাট্য, পরিচালনা ও সঙ্গীত : সত্যজিৎ রায়। মূল কাহিনী : শঙ্কর। আলোকচিত্র : সৌমেন্দু রায়। শিল্প নির্দেশনা : দুলাল দত্ত। প্রধান ভূমিকায় : বরুণ চন্দ। শর্মিলা ঠাকুর। পারমিতা চৌধুরী।

অপরের গল্প নিয়ে ছবি করতে গেলেই সত্যজিৎ রায় সে-গল্প ছবির উপযোগী করে পুনর্গঠন করে নেন। ফলে তাঁর চিত্রনাট্য একটি স্বতন্ত্র নতুন রচনা হয়ে যায়। তবু আশ্চর্য এই যে কোন মূল গল্পকার সেজন্যে শ্রীরায় অতিরিক্ত স্বাধীনতা নিয়েছেন এমন অভিযোগ করেন নি। এমন কী 'মহাপুরুষ' ছবির মূল কাহিনীকার অত্যন্ত আত্মসচেতন সাহিত্যিক পরশুরামও না।

শঙ্করের 'সীমাবদ্ধ' উপন্যাসের নির্যাস নিয়ে সত্যজিৎ যে ছবি করেছেন তাতেও মূলের অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু কোথাও মৌলিক রসের হানি হয় নি।
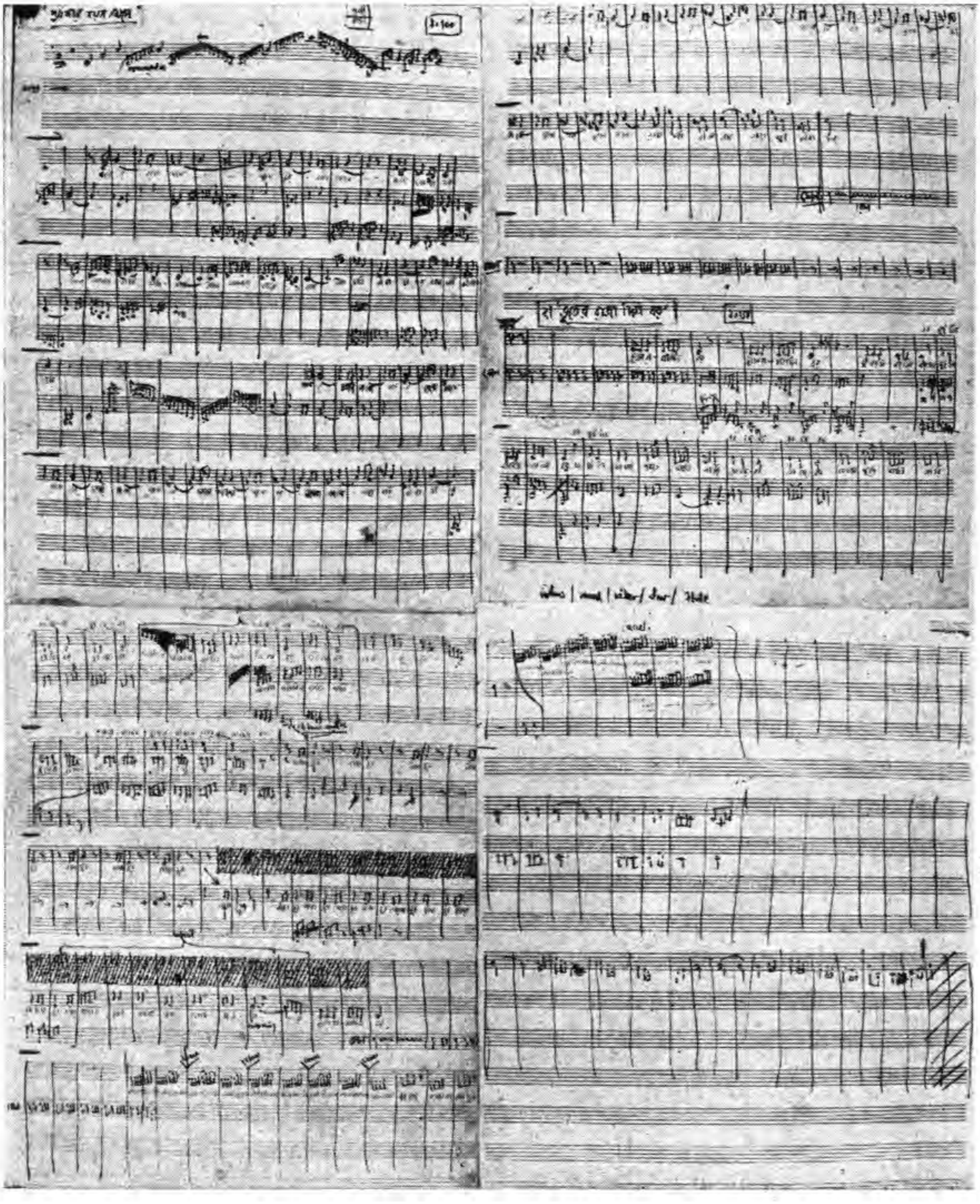
জুনিয়র একজিকিউটিভ করিৎকর্মা যুবক ধাপে ধাপে ওপরে উঠছে, চুক্তিপত্রের ফাঁক আবিষ্কার করে কোম্পানির স্বার্থে গণ্ডগোল লাগিয়েছে ফ্যাক্টরিতে, অবশেষে লকআউট ঘোষণা করিয়ে কোম্পানিকে বিরাট ক্ষতির হাত থেকে বাঁচিয়েছে, হয়েছে অন্যতম ডিরেকটার। কেরিয়ারের জন্যে নীতি ও বিবেকবোধ মুলতুবি রাখার ব্যাপারটি চমৎকার দেখিয়েছেন পরিচালক, আবার তার মনের ভেতরটাও স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি আমরা। ধীর স্থির বুদ্ধিমতী শালীর কাছে তার উন্নতি এমনই, যেন মনুষ্যত্বের পরাজয় বলে প্রতিভাত হয়েছে।

কেরিয়ারের পেছনে ছুটে নায়ক পরিবারিক সুখ ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, স্ত্রী অজস্র বিলাসের মধ্যে গড়াগড়ি দিয়ে সময় কাটাচ্ছে, স্বামীসান্নিধ্যের বিকল্প পেয়েছে অনেক অর্থের প্রতিশ্রুতির মধ্যে। শেষদৃশ্যে আনন্দ-অধীর নায়কের ব্রিফকেস নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠার দীর্ঘস্থায়ী সিকোয়েন্স, ঘরে ঢুকে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ার দৃশ্য, মাথার ওপরে অচল স্থির ফ্যান, সবগুলিই সীমাবদ্ধতার প্রতীক।

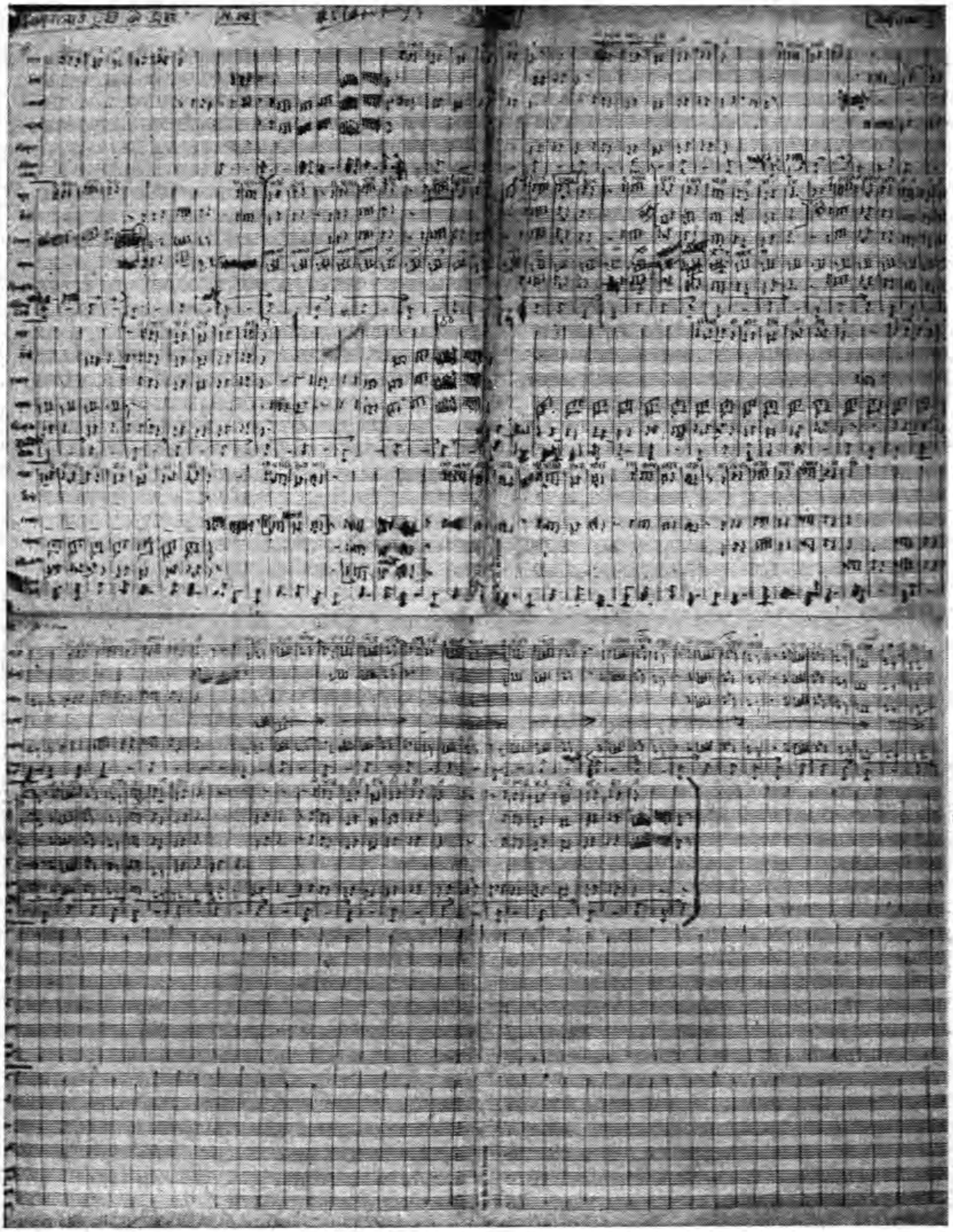
চরম সাফল্যের মুহূর্তে সব কেমন বিষণ্ণ মনে হয়, এই ট্র্যাজিক সুর ছবিকে মহান আর্টে উন্নীত করেছে।



গুপী গাইন বাঘা বাইন ॥ দ্যাখরে নয়ন মেলে



চিড়িয়াখানা ॥ ভালবাসার তুমি কী জান



পত্রগুচ্ছ

২১, ৫, ৫৬

প্রিয় সত্যজিৎ,

'পথের পাঁচালী' ও পুরস্কার সম্পর্কে আমার এই চিঠি। ছবিটি ভুল শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে বলে আমি বাস্তবিক মর্মাহত।

বুঝতে পারছি আপনি লেখার কাজে খুব ব্যস্ত। ২৮শে জুন আমি চলে যাচ্ছি। দুটি কথা আমাকে বলতে পারেন? প্রথম, 'পপা'র প্রিণ্ট কি ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটে পাঠান হয়েছিল? দ্বিতীয়, ঐ ইনস্টিটিউটে আমার আসন্ন বক্তৃতার জন্যে কিছু তথ্যাদি পাবার কথা ছিল, তার কি হল? পাব কি? অবস্থা কী রকম, দেশে ফিরে কী করলে কী হবে যদি জানান, আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমি চেষ্টার ত্রুটি করব না। 'পপা' হচ্ছে, আমার মতে, একমাত্র ছবি যার জন্যে পাহাড় নাড়ানো যায়, এবং ফ্রান্সে ইংলণ্ডে ইটালিতে যাকে দিয়ে যা করানো যায় আমি করব।

আপনার সম্পর্কে যতটুকু জেনেছি তাতে আপনার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে, পপা দেখে আমার যা মনোভাব তাতে আপনার পরবর্তী ছবির জন্যেও (না দেখেও) আমি সব কিছু করতে রাজী আছি। যারা শুধু মুখে তারিফ করে অথচ সেটার স্বীকৃতির জন্যে কুটোটি পর্যন্ত নাড়ে না আমি তাদের গণ্য করি না। আপনি বলেছিলেন, 'পপা'র প্রশংসা করলে আমার শত্রুবৃদ্ধি হবে, হতে পারে, আমি গ্রাহ্য করি না। প্রশংসাযোগ্য ব্যক্তি বা বস্তুর প্রশংসা করে অজস্র বিপদবরণে আমি রাজী আছি। জীবনে দু' দু'বার এরকম অবস্থায় পড়েছি, দু'বারই প্রমাণিত হয়েছে আমি ভুল করি নি।

মারি সিটন

অক্টোবর ৩০, ১৯৬৩

প্রিয় সত্যজিৎ,

'জলসাঘর'-এর আরো কিছু রিভিউ পাঠালাম। দ্বিতীয় সপ্তাহের বিক্রি আগের সপ্তাহের চেয়ে কমেছে, তৃতীয় সপ্তাহের প্রথম দিন বিক্রি একেবারে পড়ে গেছে। আর সপ্তাহ দুয়েক চালিয়ে আমরা ছবি তুলে দেব। গত কাল টাইম ম্যাগাজিনে 'জলসাঘর' সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে।

'জনৈক অহমিকাপ্রবণ জমিদার আপন আভিজাত্যের মর্যাদা রক্ষার জন্যে সব খুইয়ে নিঃস্ব হল, আর আমরা পেলাম অপু কাহিনীত্রয়ীর অসাধারণ পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের প্রতিভার নতুন পরিচয়।'

এই ভেবে আমি আনন্দিত যে ছবিটি আমি প্রদর্শন করেছি, যদিও জানি, তাতে সামান্যই অর্থলাভ হবে। 'অভিযান' চিত্রে ব্যবসা ভাল হবে আশা করি। আমার বিশ্বাস, মারি আপনাকে আমার কথা বলেছে, আমি নিছক পরিবেশক হতে চাই না, আমি এ ব্যবসার সৃষ্টিশীল দিকটাতেই বেশী সংশ্লিষ্ট হতে চাই।

সেদিন সকালে জেরাল্ড প্র্যাটলে, যাকে আপনি ক্যানাডিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের পক্ষে প্র্যাটলে ব্রডকাস্ট করেন, ক্যানাডার ছবির তিনি সবচেয়ে খ্যাতিমান ভাষ্যকার। তিনি আপনাকে মস্কোতে ইণ্টারভিউ করেছিলেন, সেই সাক্ষাৎকার তিনি প্রচার করেছেন জানালেন। নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত 'জলসাঘর'-এর ওপর আপনার লেখাটি তিনি পাঠ করেছেন, এবং জানতে চেয়েছেন আপনি সেটা টেপ করে তাঁকে পাঠাতে পারেন কিনা, তিনি সব রকমের খরচ বহন করতে রাজী আছেন।

মারি সিটনের লেখা 'পোর্ট্রেট অব এ ডাইরেক্টর'-এর পাণ্ডুলিপি পেয়েছি। বলুন ত' পরিচালকটি কে?

আপনাকে দেখার প্রতীক্ষায় রইলাম। 'অভিযান'-এর প্রিমিয়র উপলক্ষে আপনার আগমনই সম্ভবতঃ এই মুহূর্তে তার সবচেয়ে নিকট সম্ভাবনা।

এডওয়ার্ড হ্যারিসন

ইটালি। ২৩, ৫, ৫৬

প্রিয় মানিক,

কান ফিল্ম ফেস্টিভালে অবজার্ভার পত্রিকায় লিণ্ডসে এ্যাণ্ডারসনের লেখাটি পড়ে বিমুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি। তিনি আপনার ছবিকে কাব্যিক সিনেমার মাস্টারপিস ও আরো সব সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন। অভিনন্দন। আমি সব সময় জানি, আপনি নতুন কিছু করতে পারেন ও করবেন।

কেবল ভাবছি কী করে একবার ভারতবর্ষে যেতে পারি। টাকা-পয়সার সমস্যা বড় বেয়াড়া সমস্যা। সর্বশেষ পরিকল্পনা হল, জুনের শেষে এই ইস্কুলের কাজ শেষ করেই যাওয়া। জুনের বেতন পাব, সেই সঙ্গে ছুটির মাইনেও, দুয়ে মিলিয়ে ভারতবর্ষে পাড়ি দেবার খরচ হাতে আসবে। গিয়ে, যদি তেমন কাজকম্ম না জোটাতে পারি ত' আপনার আতিথেয়তা ভিক্ষে করব।

নর্মান

অরণ্যের দিনরাত্রি ঃ ১৯৬৯



প্রযোজনা : প্রিয়া ফিল্মস। পরিচালনা, চিত্রনাট্য ও সঙ্গীত : সত্যজিৎ রায়। মূল কাহিনী : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। আলোকচিত্র : সৌমেন্দু রায়। শিল্পনির্দেশনা : বংশী চন্দ্রগুপ্ত। সম্পাদনা : দুলাল দত্ত। প্রধান ভূমিকায় : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। শর্মিলা ঠাকুর। সমিত ভঞ্জ। সিমি। রবি ঘোষ। পাহাড়ী সান্যাল। কাবেরী চট্টোপাধ্যায়।

ফরেস্টের ডাকবাংলোয় এসে উঠেছে কলকাতার কয়েকজন অস্থিরচিত্ত যুবক, উদ্দেশ্য কয়েকটা দিন যার-যা-মন-চায় করে কাটিয়ে যাওয়া। সভ্য নাগরিক জীবনের প্রতি ওরা বীতশ্রদ্ধ। সংবাদপত্র পুড়িয়ে নাগরিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ ঘোষণা করার দৃশ্যটি তাৎপর্যপূর্ণ।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচালক ওদের বিশ্লেষণ করেছেন, নির্ভয়ে দেখিয়েছেন ওদের নিষ্প্রেম কামনা, আদিবাসীদের সরল জীবনে ফিরে যাওয়ার সাময়িক আকুতি, দেখিয়েছেন ওদের নেশাগ্রস্ত উন্মত্ত উল্লাস। গাড়ির হেড-লাইটে ওদের বিকৃত নাচের ভঙ্গি দেখিয়ে পরিচালক যেন ওদের জীবনের একটা রেখাচিত্র এঁকেছেন।

অরণ্যবাসে এসে ওরা একটি পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হল। সেখানে আর এক নাটক। বিশেষ সেই স্বামীহীনা সুন্দরী যুবতী বধূটির জীবন। এক গা গয়না পরে হঠাৎ সদ্যপরিচিত একটি অনাত্মীয় যুবকের সামনে এসে দাঁড়ানোর মধ্যে তার যে অবদমিত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে তা মর্মন্তুদ।

অরণ্যের আবেষ্টনেও যন্ত্রণা থেকে যে মানুষের মুক্তি নেই, এ ছবির প্রতিটি ফ্রেমে আমরা তা অনুভব করতে পারি।

বলিষ্ঠতা এ ছবির সবচেয়ে বড় গুণ। অন্য কোন স্বল্পশক্তি পরিচালকের হাতে পড়লে যা অশালীন হবার আশঙ্কা ছিল, সত্যজিৎ তাকে অপূর্ব সুষমামণ্ডিতভাবে প্রকাশ করেছেন। প্রথম শ্রেণীর শিল্পের এইটাই প্রাক্‌শর্ত।

সত্যজিৎ রায়ের জীবন-সমীক্ষা কোথাও এসে অতর্কিতে থেমে যায় নি। বাঙালীর জীবন যখন যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানেই তিনি সাগ্রহে উপস্থিত। তিনি অপুকে অনুসরণ করে এসেছেন নিশ্চিন্দিপুর থেকে কলকাতা পর্যন্ত। তারপর আবার সেই পথ অনুসরণ করে গেলেন অরণ্যের এক ডাকবাংলোয়, যেখানে কয়েকজন তরুণ, নির্মম পরিচিত বৃত্ত থেকে পালিয়ে নিরুদ্দেশ আত্মগোপন করেছে।



সীমাবদ্ধ | চিত্রনাট্যের অংশ

শ্যামলেন্দু ও দোলন হাওড়া স্টেশন থেকে টুটুলকে নিয়ে বাড়ি ফিরছে। শ্যামলেন্দুর গাড়ি ব্রিজের ওপর দিয়ে চলেছে। শ্যামলেন্দু ড্রাইভ করছে, তার পাশে টুটুল। পেছনে দোলন বসেছে।

টুটুল উৎসাহের সঙ্গে রাস্তার লোকজন গাড়ি ঘোড়া দেখছে।

শ্যাম: কেমন বুঝছ?
টুটুল: কী রকম স্বপ্নের মতন মনে হচ্ছে।
শ্যাম: Nightmare?
টুটুল: উহুঁ—মানে, খারাপ লাগছে না। সাত বছরের মধ্যেই যেন কেমন বদলে গেছে।
শ্যাম: তোমার চেয়েও বেশি?
দোলন: ও ত তোকে দেখে চিনতেই পারে নি জানিস।
টুটুল: আগেও চিনতেন কি?

শ্যামলেন্দু টুটুলের দিকে অর্থপূর্ণ ভাবে তাকায়। গাড়ি হাওড়া ব্রিজ ছাড়িয়ে ব্র্যাবোর্ণ রোডে পড়েছে।

দোলন: পাটনার কথা বল্ টুটুল—আমি ত তাও '64-এ গিয়েছিলাম—ও ত যায়ই নি।
টুটুল: (শ্যামলেন্দুকে) আপনার অফিসটা এখনও রয়েছে—যেখানে আপনি interview দিয়েছিলেন—



শ্যাম : থাকারই ত কথা ! উঠে গেলে খবর পেতাম নিশ্চয়ই !
টুটুল (হঠাৎ মনে পড়ে) : ও—জান—whiskyটা মরে গেছে।
দোলন : Whisky ?!
টুটুল : ও—তুমি ত দেখই নি। আমাদের কুকুর—Sidney Silky—ভীষণ মিষ্টি ছিল।
দোলন : বেচারা—কী হয়েছিল রে ?
টুটুল : Hepatitis—তিন বছর বয়স—তিন দিনের অসুখে মারা গেল—
দোলন (শ্যামলেন্দুকে) : কবে থেকে বলছি তোমাকে একটা কুকুরের কথা—
শ্যাম : কেন,—Mrs. Ferris ত বলেছেন তোমাকে একটা কুকুর দেবেন—
দোলন : সেই কবে ওর litter হবে তারপর—ততদিন বসে থাকি আর কি—!

গাড়ি এখন রেড্ রোড দিয়ে চলেছে।
টুটুলের দৃষ্টি বাইরে।

শ্যাম : তোমাকে কলকাতায় কী করে আসতে দেওয়া হল তাই ভাবছি—
টুটুল (মুখ ফিরিয়ে) : মানে ?
শ্যাম : এখানে আজকাল কেউ আসতে চায় না, জান ত ?
টুটুল (মৃদু হেসে) : আমি চাই !
শ্যাম : সেত দেখতেই পাচ্ছি। তোমার বাবা মা কী করে allow করলেন তাই ভাবছি।
টুটুল : বোধহয় ভাবলেন আপনি যখন আছেন তখন আর ভাবনা কি !

পেছন থেকে দোলনের কথায় তাদের প্রসঙ্গে ছেদ পড়ে।

দোলন : রাস্তাঘাট দেখে মনে হচ্ছে কলকাতায় এত লোক মরে টরে ?
টুটুল (কী যেন ভেবে) : আপনি এদের কাউকে চেনেন ?
শ্যাম : যারা মরছে ?



টুটুল : না !—যারা মারছে !
দোলন : দূর্ পাগল—ওর সঙ্গে কি করে আলাপ থাকবে ?

টুটুল দমে না।

টুটুল : চেনেন—? (অসহিষ্ণু) বলুন না !
শ্যাম : আপনি কি বিপ্লবীদের সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন নাকি কলকাতায় ?
টুটুল : একজন অ-বিপ্লবীও আছেন—তাঁকে study করব। (হাসে)
শ্যাম : সেটা আপনার কম্মো নয়। গভীর অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন।
টুটুল : আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে আমি Psychology পড়েছি। তাছাড়া আরো অনেক কিছু পড়েছি।
শ্যাম : Fortunately—আপনাকে দেখে সেটা বোঝার কোন উপায় নেই।

টুটুল হাসে।

শ্যামলেন্দুবের বাড়ির ড্রইংরুম। এখনো কাউকে দেখা যাচ্ছে না। দোলনকে বেয়ারার উদ্দেশে বলতে শোনা যায়—

দোলন : এগুলো গেস্টরুমে রাখ।

বেয়ারা টুটুলের luggage নিয়ে ভেতরে যায়।

দোলন (টুটুলকে নেপথ্যে) : আমি আসছিরে এক্ষুনি।

এবার দৃশ্যপটে টুটুলের আবির্ভাব হয়। টুটুল সপ্রশংস দৃষ্টিতে ঘরটা দেখতে থাকে।



শ্যাম : পিটার্স ল্যাম্প !—(সঙ্গে সঙ্গে ঘরের একটা আলো জ্বালায়)

টুটুল ফিরে চায়। শ্যামলেন্দুর বলার ধরণে মজা পায়।

শ্যাম : পিটার্স ফ্যান !

টুটুল সিলিং-এ তাকায়। শ্যামলেন্দু ফ্যানটা অন্ করে দিয়েছে।

টুটুল : আপনার তৈরি ?
শ্যাম : আমার factory-র তৈরি। I sell them !

দোলন বেডরুম থেকে বেরিয়ে বোনের কাছে আসে।

দোলন : আমি কতদিন ধরে অপেক্ষা করে আছি তোকে ফ্ল্যাটটা দেখাবো বলে—। ভাল না ?—এদিকে আয়।

টুটুলকে ধরে নিয়ে জানালার কাছে যায়। দুজনে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, বাইরের দৃশ্য দেখে।

টুটুল : ঈস্ !

উঁচু বাড়ি থেকে শহর-কলকাতার চমৎকার ভিউ দেখা যায়।

দোলন : রাত্রে প্রায়ই দুম্‌দাম আওয়াজ শোনা যায়, জানিস। কিন্তু কোনটা যে বন্দুক কোনটা বোমা বোঝা যায় না—
টুটুল : কিন্তু এখন কী রকম peaceful মনে হচ্ছে !
দোলন : সেটা শুধু আটতলা বলে। আমার ত ভয় ছিল যদি নিচের ফ্ল্যাট দিয়ে দেয়। ওপরেই ভাল, —ধুলো ধোঁয়া মশা মাছি সবই কম।...আয় তোর ঘর দেখাই।

দোলন টুটুলকে নিয়ে গেস্টরুমে আসে।

দোলন : তোর একা শুতে ভয় করবে না ত ?
টুটুল : ওখানে আর কার সঙ্গে শুই দিদি—।
দোলন : Airconditioner আছে, ইচ্ছে করলে use করতে পারিস। অবশ্য পাখাও আছে।
টুটুল : না। পাখাই ভাল।
দোলন : আমারও, জানিস, একদম জানালা বন্ধ করে শুতে পারি না।

টুটুলকে নিয়ে বাথ্‌রুমে আসে।

দোলন : তোর জন্যে তোয়ালে সাবান সব ready করে রেখেছি—কিচ্ছু লাগবে না।

টুটুলের দৃষ্টি geyser-এর দিকে যায়।

টুটুল : ওটা কী ?
দোলন (হেসে) : দাঁড়া, দেখিয়ে দিচ্ছি—

দোলন geyser এর কাছে গিয়ে সুইচ্ অন্ করে।

দোলন : এটা অন্ করলি ত ?—এবার ছাখ lightটা জ্বললো ওখানে,—তারপর পাঁচ সাত মিনিট বাদে কলটা খুললেই গরম জল পাবি।
টুটুল : Burst-turst করবে না ত ?
দোলন : দুর্ পাগলি ! (সুইচ্টা অফ্ করে) আয়—।

টুটুলকে নিয়ে আবার গেস্টরুমে আসে।

টুটুল : এ ঘরটা বুঝি খালিই পড়ে থাকে ?

দু'জনে বসে।

দোলন : বেশির ভাগই। সেবার ধানবাদ থেকে ওর এক বন্ধু এসেছিল—ছিল কিছুদিন।
টুটুল : আর তোমার শ্বশুর শাশুড়ী ?
দোলন : ওঁরা—বালিগঞ্জে তোর শ্যামলদা ওঁদের একটা ফ্ল্যাট দেখে দিয়েছেন—ওখানেই থাকেন।

টুটুল যেন অবাক হয়।

টুটুল : সেকি, ওঁরা এখানে থাকতে পারেন না ?
দোলন : আর বলিস না—এইসব বিলিতি ফার্মের covenanted অফিসারদের প্রচুর নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। বাবা-মাকে permanently থাকতেই দেয় না।

টুটুল কথাটায় খুশি হয়েছে বলে মনে হয় না।

দোলন : ও ত তাও fight করবে বলেছিল। কিন্তু শেষে শ্বশুরমশাই বললেন—খোকার অসুবিধা হবে—আলাদাই ভাল—

ইতিমধ্যে শ্যামলেন্দু আপিসে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে গেস্টরুমের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

টুটুল : আপনার কিন্তু খুব অন্যায়—এতসব আজেবাজে নিয়ম মানেন কেন ?

শ্যামলেন্দু অভিনয়ের ভঙ্গিতে টুটুলের কাছে এগিয়ে এসে ঘাড় হেঁট করে।

শ্যাম : মারো—ক' ঘা জুতো মারবে মারো !

টুটুল হেসে ফেলে।

টুটুল : না সত্যি—বাড়িটা দারুণ।

তিনজনে ড্রইংরুমে আসে।

টুটুল : আমি ত ভাবতেই পারি নি আপনি এতটা উন্নতি করেছেন—
দোলন : সেকি রে !—এরপরেই ত director !
টুটুল (সাগ্রহে) : কবে ?
শ্যাম : তার কোনো ঠিক নেই। তবে হলে এর চেয়েও ভাল ফ্ল্যাট।
টুটুল : সেখানে হয়ত আমাকেও থাকতে দেবে না !
শ্যাম : উঁহু। শ্যালিকার ক্ষেত্রে কোন নিয়ম মানা চলবে না !…চলি—

শ্যামলেন্দু প্যাসেজের দিকে এগোয়।

টুটুল : আরে, কোথায় চললেন ?
দোলন : কোথায় আবার ! অফিস ! শনিবার ছুটি হলে কি হবে—ঠিক অফিস যাওয়া চাই।

শ্যামলেন্দু প্যাসেজের মুখে এসে থামে। পকেট থেকে সিগারেট বের করে।

শ্যাম : পৌনে একটার সময় আমি তোমাদের এসে pick up করছি,—তারপর ক্লাবে গিয়ে lunch.
দোলন : আমাকে কিন্তু আজকে চুল করতেই হবে।
শ্যাম : All right—lunch এর পর তোমাকে আমি ইভ্‌স্‌-এ ড্রপ করে দেব—
সিগারেট মুখে দেয়।
শ্যাম : তারপর race course-এ গিয়ে গাড়িটা পাঠিয়ে দেব--তোমার চুল করা হয়ে গেলে আমাদের সঙ্গে এসে meet করো।

টুটুল অবাক হয়।

টুটুল : Race ! Race মানে ?
দোলন : তুই জানিস না বুঝি শনিবার race হয় ?
টুটুল : তোমরা race-এ যাও ?

শ্যামলেন্দু সিগারেট ধরিয়েছে।

শ্যাম : ও জিনিসটা না দেখা হলে কিন্তু তোমার study অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।
টুটুল : আপনিও খেলবেন ?—মানে, bet করবেন ?
শ্যাম : আপনিও খেলবেন ! (দোলনকে) তবে ঐ শাড়িটা পরে যাওয়া চলবে না কিন্তু।
টুটুল : কেন, শাড়িটা খারাপ নাকি ?
শ্যাম : Not worthy of you !
টুটুল : আহা—থার্ডক্লাস স্লিপারে এরচেয়ে বেশি ভাল শাড়ি কি পরব বাবা—।

দোলন এগিয়ে এসে টুটুলের কাঁধে হাত রাখে—

দোলন : তোমাকে তার জন্য ভাবতে হবে না। বাড়িতে কি শাড়ির অভাব আছে নাকি ? ওর সাজের ভার আমার ওপর।

টুটুলকে ধরে নিয়ে বেড্‌রুমের দিকে যায়।

শ্যাম : All right,—bye-bye !

শ্যামলেন্দু বাইরে যাবার মুখে সুইচ্‌ দুটো অফ্‌ করে দেয়।

আমি সত্যজিৎ রায়কে দেখি নি

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

একটা গল্পের মত সত্যি ঘটনা দিয়ে সুরু করা যাক।

ছবি বিশ্বাস নাকি সঙ্গীতে একেবারে আকাট তালাকানা ছিলেন, ফলে 'জলসাঘর'এর সঙ্গীতরসিক জমিদার বিশ্বম্ভর রায়ের চরিত্রটি বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপিত করতে পরিচালককে বিষম বেগ পেতে হয়েছিল। ছবির সুটিং উপলক্ষে সত্যজিৎ রায় কিছুদিন নিমতিতার রাজবাড়িতে ছিলেন, বলা বাহুল্য, ছবি বিশ্বাসও ছিলেন সঙ্গে। একদিন রাত্রে, পরদিন রায়বাড়ির উৎসবের দৃশ্যে ব্যবহারের জন্যে, মুর্শিদাবাদ থেকে ব্যাণ্ডপার্টি এসেছে, তারা মহড়া দিচ্ছে, হঠাৎ নিজের ঘর থেকে ছবিবাবু বেরিয়ে এলেন। তিনি তখন ভয়ঙ্কর অস্থির ও বিরক্ত, সত্যজিৎবাবুকে বললেন, এসব হচ্ছে কী? পরিচালক বললেন, কাল যে সিন টেক হবে তারই জন্যে ব্যাণ্ড, একটু মহড়া দিচ্ছে। ছবিবাবু বললেন, ডু ইউ কল দিস এ ব্যাণ্ড! না আছে তাল, না আছে স্পিরিট—হুঁঃ! সত্যজিৎবাবু বললেন, গ্রামদেশে এর চেয়ে ভাল আর কী পাবেন বলুন। ছবিবাবু আরও বিরক্ত হয়ে বললেন, কিসসু হসসে না, কিস্‌সু হসসে না। বলতে বলতে সঙ্গীত উদাসীন ছবিবাবু তাল-মান সম্পর্কে অতর্কিতে সচেতন হয়ে উঠলেন, রেলিংয়ের ওপর দিয়ে অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে ঝুঁকে পড়ে দু' হাত মাথার ওপর তুলে ব্যাণ্ড কনডাক্ট করা সুরু করলেন, সেই সঙ্গে তারস্বরে চীৎকার—ওয়ান টু থ্রি—ওয়ান টু থ্রি—

সত্যজিৎ রায়ের নিজের লেখা এই গল্পটি এইখানেই শেষ হয়েছে, কিন্তু লেখকের প্রচ্ছন্ন কৌতুকহাস্য তার পরেও অনেকখানি শূন্যস্থান ভরে দিয়েছে।

আমি সত্যজিৎ রায়কে দেখি নি, জাঁক করে একথাটা বলছি, যেন বাদ্যভাণ্ড সহযোগে, অব্যাপারেষু ব্যাপারং দেখে সহৃদয় পাঠক বিরক্ত বোধ করতে পারেন, স্বতঃই ভাবতে পারেন, সঙ্গতভাবেই পারেন, যে দেশ-বিদেশের তাবড়-তাবড় ব্যক্তিরা নিত্যদিন এক সঙ্গে ওঠা বসা করে যাঁর সম্পূর্ণ মূল্যায়ন পারল না, তুমি একবারও না দেখেই তাঁর সম্পর্কে বলবে কোন অধিকারে? আমার সবিনয় উত্তর, যে-অধিকারে সত্যজিৎ রায়ের উপস্থিতিতেও ছবিবাবু ব্যাণ্ড কনডাক্ট করেন, সেই অধিকারে। এ লেখা সত্যজিৎবাবুর চোখে পড়লেও আমার লজ্জার কিছু নেই, জানি প্রসন্ন কৌতুকহাস্যে তিনি আমাকে প্রশ্রয় দেবেন।

দেখাটাই সব, না দেখাটা কিছুই না, এমন স্বতঃসিদ্ধে আমি বিশ্বাস করি না, বিশেষত বড় মাপের মানুষের বেলায়। ওঁরা আচরণে অনেকটা শামুকের মত, আত্মগোপনের দুর্গটি সঙ্গে বয়ে বেড়ান, দর্শনার্থীকে উপযুক্ত বিবেচনা না করলে অনায়াসে তার মধ্যে ঢুকে পড়েন, শুকনো খোলস দর্শন ত' শামুক দেখা নয়। যারা সত্যজিৎকে দেখেছে বলে জাঁক করে তারাও অনেকে যে ফাঁকি পড়েছে, টের পায় নি; শুনেছি অমায়িক সজ্জন তিনি, তাঁর সৌজন্যবোধ প্রবাদখ্যাত, সকলকেই যথাসাধ্য বাধিত করেন। অমন একটি সর্বংসহ মানুষ দেখার লোভ নেই আমার, কেমন যেন মনে হয় সত্যজিৎ রায় একটু বেশি মাত্রায় আত্মসচেতন, মাত্রাতিরিক্ত দেমাকী হলে মানাত, যশ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সংগতি রক্ষা হত। চিত্রামোদীদের ছোটবড় ঘনিষ্ঠ আড্ডায় তাঁকে এত লোক মানিকদা-মানিকদা বলে উল্লেখ করে শুনি যে আমি আতঙ্কিত হই। এদের শতাংশের একাংশও যদি তাঁর বাড়িতে যাতায়াত করে তাহলে নিশ্চয়ই তিনি বিব্রত বোধ করেন, অহঙ্কারী অপবাদ থাকলে তিনি এর হাত থেকে রক্ষা পেতেন।

এমন সহজলভ্য মানুষটিকে আমি দেখি নি, একাধিক সুযোগ পেয়েও ওঁর বাড়িতে দেখা করতে যাই নি। গিয়ে কী বলব? দু'চারটি সৌজন্যমূলক বিনয় ভাষণের পরেই কথা ফুরিয়ে যাবে, কথা ফুরোলেই আকাঙ্ক্ষা ফুরোয় না, বসে থাকব, কী নিয়ে সত্যজিৎবাবু কাজ করছেন দেখবার জন্যে উঁকিঝুঁকি মারব, মানুষটি আপন কাজে মনোনিবেশ করতে পারবেন না। ভাববেন, বাইরে দরজায় যে ইংরেজি নির্দেশ লেখা আছে, আমাকে বিরক্ত করবেন

না, সেটা কি ও দেখে নি? এদেশে খ্যা তি মা ন মানুষ মাত্রেই দুর্গত, সত্যজিৎ রায় চরম দুর্গত, আমি তাঁর দুর্গতি বাড়াতে চাই না।

তবু ওঁকে আমি চিনি, অনেক ঘনিষ্ঠ সা ন্নি ধ্য লোভী মানিকদা-অনুরাগীর চেয়ে বেশি চিনি। সেই কথাটা বলার জন্যেই এত কথা। আসলে গাওনা ভারি হয়ে যাচ্ছে, অথচ ধরতাই ঠিক হয় নি। সত্যজিৎবাবুর 'পোস্টমাস্টার' ছবিতে গ্রাম্য বৃদ্ধদের আড্ডায় হারমোনিয়ম, তবলা ও বেহালা সহযোগে একটি গানের দৃশ্য আছে। যিনি গান গেয়েছেন তিনিই গানটি বেঁধে এনেছিলেন, স্যুটিংয়ের আগে গানটি শুনে পরিচালক বললেন, আড্ডাটা বসছে সন্ধেবেলায়, আশাবরী রাগ চলবে কি? গায়ক-সুরকার ভদ্রলোক একটুও অপ্রস্তুত হলেন না, মিনিট দশেক কসরৎ করে সেই আশাবরী গানকেই পূরবী ঠাটে ঢেলে সাজলেন। আমার অবস্থাও হয়েছে অনেকটা সেইরকম, আমি রাগ বদল করছি।

সত্যজিৎ রায়ের ফিল্মের কথা অনেক বলা হয়েছে, এই বিশেষ সংখ্যাতে বিদেশী চিত্রবোদ্ধাদের মতামত প্রায় নিঃশেষিতভাবে সঙ্কলিত। যাকে দিয়ে যা হবে ঠিক তাই করিয়ে নেবার শক্তি আছে সত্যজিতের, কোনকালে ক্যামেরা দেখেন নি এমন লোককে দিয়েও তিনি অবিশ্বাস্য রকমের অভিনয় করিয়ে নিয়েছেন, নিজেও একবার গলা দিয়েছেন ভূতেররাজার চরিত্রে। ছবিতে তিনি অভিনয় করেন নি, করবেনও না কোনদিন। কিন্তু ওঁকে নিয়ে যে একটা ছবি হওয়া দরকার, একটি ডকুমেন্টারি; সে-ছবি সত্যজিৎ ছাড়া কেউ করতে পারবেন না, সুতরাং আমার কল্পনার সে-ডকুমেন্টারি দেখাও হবে না। বিধান রায় অসুস্থ হলে যেমন সেকালের সবচেয়ে বড় ডাক্তারের চিকিৎসা থেকে তিনি বঞ্চিত হতেন, এও অনেকটা তেমনই। একই সঙ্গে ক্যামেরার সামনে এবং পেছনে কেমন করে থাকবেন সত্যজিৎ রায়?

আমি সত্যজিৎ রায়কে দেখি নি বলেই নানারূপে ওঁকে পাই—প্রচ্ছদপট আঁকছেন, নতুন রকমের অঙ্গসজ্জায় বাংলা বই ঝলমল করে উঠল, ক্রেতাদের আগ্রহ বাড়ল, বইয়ের মলাটই হল ললাট। তারপর বইয়ের মলাটের ভেতরকার বস্তুতেও মনোনিবেশ করলেন, আমরা ফেলুদাকে পেলাম। 'গুগাবাবা' ছবি নির্মাণসূত্রে রাজস্থানে ঘুরেছেন সত্যজিৎ, সোনার কেল্লার রহস্য উদ্ঘাটনে সে-দেশে গেছেন ফেলুদা, ছ'ফুট লম্বা দশাসই মানুষ; আমার কেমন সন্দেহ হয়, সত্যজিৎই ফেলুদা। ফেলুদা ওরফে সত্যজিৎ আমাদের বিনামূল্যে রাজস্থান ঘুরিয়ে এনেছেন, তাঁর সঙ্গে কিষণগড় স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নেমে চা খেয়েছি, উটের দুধের চা, জয়পুর যোধপুর বিকানির ঘুরেছি, দেখেছি দেবীকুণ্ড—যেখানে রাজপুত যোদ্ধাদের স্মৃতিস্তম্ভ ছড়ানো। এ আর এক বায়স্কোপ, সত্যজিৎ যেন হাতল ঘোরাচ্ছেন আর বলছেন, দেখো দেখো, জয়পুর দেখো, সোনে কা কেল্লা দেখো। এমন রুদ্ধশ্বাস ডিটেকটিভ গল্পের সঙ্গে মনোরম ভ্রমণ কাহিনীর মিশেল বড় একটা চোখে পড়ে না, এ গল্পের ছবি হয় না?

সত্যজিৎ রায়কে একবারও দেখি নি বললে বোধহয় মিথ্যে বলা হয়। একবার হাওড়া-দিল্লী ভেস্টিব্যুলে দিল্লী যাচ্ছেন সত্যজিৎ রায়, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার আনতে। সেই গাড়িতে হঠাৎ আমি ওঁকে আবিষ্কার করলাম, মাথায় উঁচু, শ্যামবর্ণ, ভরাট মুখে অজস্র দাগাদাগি কাটাকুটি, আয়ত চোখ অন্তর্ভেদী, একমনে বসে লিমেরিক লিখছেন। পাশে একটা কাগজে দেখলাম শব্দ-জব্দের ছক পড়ে আছে।

গাড়ির শব্দ হচ্ছে ঝিক ঝিক। আমি একেবারে মুখোমুখি বসে পড়লাম একটা আসনে। সত্যজিৎ মুখ তুলে বললেন, কিছু বলবেন?

আমি ভূমিকা না করে জিগ্যেস করলাম, 'দ্রবময়ীর কাশীবাস' গল্পটা কি ছবি হবে না কোনদিন?

বললেন, চুনীবালা নেই।

আমি বললাম, আপনি ত আছেন।

মৃদু হাসলেন তিনি।

আমি থামলাম না, দ্বিতীয় প্রসঙ্গ তুললাম, বাংলা ছবির নাটুকেপনা সারিয়ে তুললেন, একটা বাংলা নাটক লিখুন না—চিত্রনাট্য নয়, মঞ্চ নাটক, আমরা পড়বার মত একটা নাটক পাই।

গাড়ি চলার শব্দ হঠাৎ থেমে গেল, আমার রাতের রেলগাড়ি, আমার স্বপ্নের রেলগাড়ি সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে হারিয়ে গেল।

---

* এই লেখাটি প্রেসে দেবার পরে সত্যজিৎ রায় সংখ্যা প্রস্তুতি সূত্রে লেখক শ্রীরায়কে প্রথম দেখেন। সে আর এক অভিজ্ঞতা।

সত্যজিতের স্ক্র্যাপ বই

ধ্রুবজ্যোতি রায়চৌধুরী

সত্যজিৎ প্রতিভার প্যাটার্নটি সম্ভবত ধুলো-জমা বহু বিচিত্র এক প্রজাপতি পাখনার মতো। ঠিক ওই প্রজাপতির মতোই হয়তো তাঁর মনোভাব, সম্ভবত তিনি জানতেও পারেন না প্রজাপতি-পাখনার ওপর জমা-হওয়া ধুলোয় প্রতি মুহূর্তে কী এক অসাধারণ ছবি তৈরি হয়ে যাচ্ছে—আবার তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে পরের মুহূর্তে। তা যদি তিনি জানতে পারতেন, তাহলে আমরা হয়তো আর অসম্ভব বিস্ময়ে অভিভূত হতে পারতাম না।

সত্যজিতের স্ক্র্যাপ বই দেখতে দেখতে এই কথাগুলোই আমার বার বার মনে হয়েছে। তার আগে একটু বলে নিতে পারি, সত্যজিৎ সম্পর্কে আমার ধারণা কতটুকু।

অচিন্ত্য সেনগুপ্তের 'ইন্দ্রাণী' বই-এর মলাট দেখে আমি প্রথম সচকিত হই সত্যজিৎ সম্পর্কে। এরপর, সিগনেট বুকশপ থেকে প্রকাশিত ফোল্ডারগুলোয় (সম্ভবত 'টুকরো কথা') আমি সত্যজিতের নাম আগ্রহের সঙ্গে দেখে আসতাম। তখনও বুঝতে পারি নি, আন্দাজ করতে পারি নি, এই লোকটির নামের সঙ্গে আমার আবার পরিচয় হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন দেশে, ভিন্ন পরিবেশে। কল্পনাও করি নি এই লোকটিকে কোনদিন চাক্ষুষ দেখবো খুব কাছাকাছি।

সত্যজিতের নামের সঙ্গে আমার দ্বিতীয়বার পরিচয় হয়েছিলো আমেরিকায়। বোস্টনে।

বিদেশে থাকলে একটু মেজাজ ভালো রাখার জন্যে নানা জায়গায় আড্ডা গাড়তে হয়। আমারও এমনি একটি আড্ডা ছিলো বোস্টনে।

বোস্টনের শহরতলি এলাকায় ছিলো ছোট্ট একটি পুরনো ধাঁচের বার। জ্যাক্স বিয়ারের কবোষ্ণতা, ক্যামেল সিগারেটের সাইকাডেলিক আমেজ আর সেই সঙ্গে বাণ্ডিল বাণ্ডিল কথা বলার সংযোগ—আমি রোজ সন্ধ্যে হলেই একবার ঢুঁ মারতাম ওখানে।

মাঝে মাঝে একটু আগেই পৌঁছে যেতাম। বার ফাঁকা থাকতো, এবং যে মহিলা বারটি চালাতেন তিনি নানা ধরনের গল্প জুড়ে দিতেন আমার সঙ্গে। আমেরিকান প্রোটিন প্রচুর পরিমাণে খাওয়ার জন্যে মহিলার স্বভাবটিও ছিলো যাকে বলে, স্নেহ পদার্থের।

মহিলাকে গল্প শোনাতাম কখনো ভারতবর্ষের, কখনো জার্মানির, কখনো কানাডার। সোনালি দাশগুপ্তের পালিয়ে যাওয়ার গল্প শুনে মহিলা হেসে গড়িয়ে পড়তেন। জার্মানরা যাকে বলে ফাঁসি-যাওয়া হাসির গল্প, মহিলাটি ঠিক সেই ধরনের গল্প শুনতে ভালোবাসতেন।

মহিলা যে সিরিয়স, আমি জানতে পারলাম সেদিন, যেদিন উনি লরেন্স ও হাক্সলি নিয়ে এক দীর্ঘ আলোচনা চালালেন জ্যাকসের টিনে চুমুক দিতে দিতে।

আলোচনাটি লরেন্স-হাক্সলি ছেড়ে হেনরি জেমস, জেমস জয়েসের বেড়া ছুঁই-ছুঁই করছে, এমন সময় দুরন্ত মাতাল অবস্থায় বারে এসে ঢুকলেন একজন আর্টিস্ট। সঙ্গে দুটি মেয়ে। মডেল।

মডেল দুটি খুবই অল্প বয়েসী, খুবই সুন্দরী। একজন একটু বেঁটেখাটো, ঈষৎ ধূসর, চোখে-মুখে নকল ডিপ্রে-ভিটির ছাপ, অন্যজন আর একটু লম্বা, চোখে মুখে ছেলেমানুষী ভাব। বুঝলাম, বোস্টনের উঠতি আভা গার্দ-এর সদস্যা ওরা।

আর্টিস্ট দরাজ হাতে বিয়ার ঢাললো সকলের গ্লাসে। বললো, টু আপু···হেই ইউ ইণ্ডিয়ান?

ঘাড় নাড়লাম।

হোআট য়ু' ইল ড্রিংক?

ব্যাপার কী? মেঘ না চাইতেই জল?

মডেল মেয়ে দুটি ডিসপ্রেয় কায়দায় হাত নাড়লো, আপু···ইণ্ডিয়ান পিকিনিনি···উইই···

মানে, আপু, ভারতীয়? বাচ্চা ছেলে?

ওরা কী তাহলে কোনো হারিয়ে যাওয়া বাচ্চা ছেলের কথা বলছে, যে আমার স্বদেশীয়?

আর্টিস্ট ধমক দিলো, সাডাপ!

আপু…লিটল বয়…রে' স কুল ওয়াটার কালার।

ওরা কী তাহলে ওয়াটার-কালার কোনো ছবির আলোচনা করছে? বারের মহিলা এবার ওদের উদ্দেশে বললেন, স্টপ ইয়াপিং, স্যামি।

ইয়াপিং? বলস। ডোন্ট বুলসিট…

তারপরই স্যামি আমার হাত ধরলো, কাম'ন কিড।

সেই মুহূর্তে ভারতবর্ষে আমার চেনা-জানারা হয়তো ভাবতেও পারেন নি বোস্টনের একজন দো-আঁশলা নিগ্রো আর্টিস্ট মত্ত অবস্থায় আমাকে টেনে হিঁচড়ে এনে বসিয়ে দিয়েছিলেন বোস্টনের একটি আর্ট থিয়েটারে, আর আমি সম্মোহিতের মতো বসে গিয়েছিলাম 'পথের পাঁচালী' দেখতে, স্যামি বর্ণিত 'রে'স কুল ওয়াটার কালার' দেখতে।

সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত ধারণা হয়তো এখানেই শেষ হোতো। তুর্গেনিভের ল্যাণ্ডস্কেপ, টলস্টয়ের যুদ্ধের দৃশ্য কিংবা ডস্টয়ভস্কির অবিশ্বাস্য গল্পের মতোই, সত্যজিতের পথের পাঁচালীকে হয়তো চিরকাল মনে করে রাখতাম, যদি না হঠাৎ আজ সত্যজিতের স্ক্র্যাপ বই ওলটাবার সুযোগ পেতাম কলকাতায়। স্ক্র্যাপবইটা উল্টেছি বলেই এরপর আর শুধু 'পথের পাঁচালী' নয়, সত্যজিৎ সম্বন্ধে সব কথাই মনে রাখবো আমি। সব কিছু শিখতে পেরেছি, জানতে পেরেছি স্ক্র্যাপবই থেকে।

ধারণা ছিলো, সত্যজিৎ বোধ হয় তোয়াক্কা করেন না সাধারণ মানুষ তাঁর ছবি সম্পর্কে কী ভাবেন। কিন্তু আমার ধারণা বদলালো স্ক্র্যাপবই ঘাঁটতে গিয়ে যখন চোখে পড়লো স্ক্র্যাপবইয়ে সযত্নে আঁটা নামী-দামী সমালোচনার পাশে কলকাতার খবরের কাগজে প্রকাশিত কোনো অজ গাঁয়ের ঠিকানা দেওয়া জনৈক অখ্যাত অজ্ঞাতের লেখকের সম্পাদক সমীপে—'সত্যজিৎ-ছবি' সম্বন্ধে চিঠিটাও সুন্দরভাবে আটকানো আছে।

চিঠিগুলো শুধু সুন্দরভাবে এঁটে রেখে স্ক্র্যাপবইয়ের স্ফীতি বর্ধিত করেন নি সত্যজিৎ, সতর্কভাবে কোনোটায় দাগ মেরেছেন, কোনোটায় আবার আণ্ডারলাইন করেছেন। চিঠিগুলো যে তিনি কত মন দিয়ে পড়েছেন, তা দাগ আর আণ্ডারলাইনের রকম দেখলেই বোঝা যায়। বোঝা যায় সাধারণ মানুষের কথা তিনি কত মন দিয়ে শোনেন, ভাবেন।

এরপর পত্র-পত্রিকার রিভ্যু, ক্রিটিসিজম-এর পাতাগুলো চোখে পড়বে। স্বপক্ষে-বিপক্ষে যা কিছু লেখা হয়েছে কাগজপত্রে, এদেশে কিংবা ওদেশে, সত্যজিৎ খুব যত্ন করে সেগুলো রেখে দিয়েছেন। এদেশের কাগজে প্রকাশিত ভাড়াটে চিত্র-সমালোচকদের অর্থহীন বিশেষণে ভরা আরো অর্থহীন সমালোচনার পাশে পাশে, বাংলা লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সত্যজিৎ-আলোচনাগুলিও স্থান পেয়েছে। য়ুনিভারসিটির ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সমালোচনাও ঢুকে আছে ভাড়াটে, লিটল ম্যাগাজিন-সমালোচনার জানালায়।

মজার ব্যাপার, ভারতবর্ষের তথাকথিত সবজান্তা সমালোচনাগুলি স্ক্র্যাপবইয়ে অম্লানবদনে আটকানো আছে। একটা টিকের দাগও দেখা যাবে না সেখানে। কিন্তু পাশাপাশি লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সমালোচনাগুলি অসংখ্য দাগ আর আণ্ডারলাইনে ভরা। য়ুনিভারসিটির পত্রিকায় জনৈকা দর্শনের ছাত্রী তীক্ষ্ণ, তীব্র সমালোচনা করেছিলো 'অপুর সংসার'এর, ইচ্ছে করলে সত্যজিৎ নাও রাখতে পারতেন লেখাটা, কিন্তু না, সত্যজিৎ লেখাটা শুধু সযত্নে রেখেই দেন নি, বিশেষ বিশেষ জায়গায় দাগ মেরে রেখে দিয়েছেন। লিটল ম্যাগাজিনের সমালোচনাকে বাংলাদেশের থান-ইট-উপন্যাস-কাম-সাহিত্য লেখকরা যেখানে পাত্তা দেন না, সেখানে সত্যজিতের মতো এক বিশাল ব্যক্তিত্ব লিটল ম্যাগাজিনকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন, এটা ভাবলেও গর্বিত হতে হয়।

সত্যজিৎ যে কাউকে কখনো ছোটো চোখে দেখেন নি, দেখতে পারেন না—সত্যজিতের স্ক্র্যাপবইয়ের পাতায় পাতায় এই সত্যিটাই সহজ, স্বচ্ছ, স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সত্যিকার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র, যা সোজাসুজি কথা বলে, পৃথিবীর সব দেশের সব মানুষের কথা, তার শিকড় জাতীয় মাটিতে, জাতীয় বিষয়বস্তু ও উৎসের প্রতি সে ছবি অবশ্যই বিশ্বস্ত। সত্যজিৎ রায়ের মত খুব কম চিত্রনির্মাতাই সেকথা জানেন।…'জলসাঘর' ছবিতে শ্রীরায় তাঁর সস্নেহ, খানিকটা বা নস্টালজিক, ক্যামেরা ঘুরিয়েছেন এমন একটি জীবনের দিকে যে জীবনযাত্রা অদৃশ্য হয়ে গেছে, তবু এ ছবিতে জীবনবোধ তীব্র। জমিদার-নায়কের জীবনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই, তবু মানবতার দিক থেকে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বোধ করতে অসুবিধা হয় না।

[সাটারডে রিভিউ

ছোট মুখে বড় কথা

সুব্রত রাহা

যত বড়ো মুখ নয় ততো বড়ো কথা, এই বলে দোহাই আমায় কেউ ধমক দেবেন না, আমি সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে দু'চার কথা বলতে চাই। আমি ভালো ভাবেই জানি সত্যজিৎ রায় সংখ্যা 'ঘরোয়া' পত্রিকার কোনো পাঠক ধরতে পারবেন না কোন অনুবাদটি আমার, অতএব কোন বাদানুবাদ হবে না তাঁদের সঙ্গে, তবে অবশ্য সহ অনুবাদকরা জানেন আমার এলেম কতদূর।

বিদেশী সমালোচকদের লেখার অনুবাদ ও স্ক্র্যাপ বুক থেকে মূল্যবান লেখা বাছতে আমরা সত্যজিৎ রায়ের বাড়িতে প্রবেশাধিকার পাই; নচেৎ আমার মতো এমন বেঁটেখাটো বাঙালি ধাপ্পাবাজ লেখক কি করে এত লম্বা-চওড়া, এমন অদ্ভুতকর্মা আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান পুরুষের, বাড়ির ত্রিসীমানা মাড়াতে পারে, যাঁর ঘরের দরজায় ইংরাজিতে লেখা আছে, প্লিজ ডু নট ডিসটারব।

সত্যজিৎ রায় এই নামটি এখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতন একটা আন্তর্জাতিক গর্ববোধের উদ্রেক করে। আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশের লোক, আমি সত্যজিৎ রায়ের সমকালীন নাগরিক, অর্থাৎ এই কলকাতা শহরের একই ধূলি-ধূসর আকাশের তলায় আমি ও তিনি নিঃশ্বাস নিচ্ছি। তবে আমি বেঁচে আছি তাদের সঙ্গে, যারা আমার মতো। কেউ ভগ্নস্বাস্থ্য, ধাপ্পাবাজ, পরশ্রীকাতর লেখক, কেরানি, সম্পাদক কিংবা চোরাকারবারী, যেন জলে দুধে মিলেমিশে থাকা চুপটি করে, ঘাপটি মেরে।

এখন কোন চতুর পরমহংস পারেন এ সমাজের নীর থেকে ক্ষীরটুকু তুলে জলকে তলায় ফেলে দিতে, এবং এও আমি জানি, আমার মতো যারা, তখন তারা যাবে জলের তলায় তলিয়ে।

এই দেখ। সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে বলতে বসে কোথায় সমাজতন্ত্রের কানাগলিতে ঢুকে পড়েছি; পাঠক, আমাকে মাফ করবেন। তারপর যা বলছিলাম, কলকাতা—এখানে কত বিখ্যাত, বিদ্বান, সাধু, সজ্জন. চোর, গাঁটকাটা কেমন পাশাপাশি, মাথামাখি বসবাস করছেন কত দীর্ঘকাল ধরে। ক'জনকে আমি চিনি, তবে বিখ্যাত ব্যক্তিদের চিনে লাভই বা কি, কারণ তাদের দেখলে তো ঈর্ষানল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে, যেহেতু আমি উচ্চাকাঙ্ক্ষী মধ্যবিত্ত বদহজমী বাঙালি, বরঞ্চ তাঁদের না দেখে, না চিনে, কিছু মুখরোচক স্ক্যানডেল চায়ের টেবিলে শুনলে বা শোনাতে পারলে মনটা খুশি থাকবে। স্ক্যানডেলের মধুচক্রে গৌড়জন মধুপান করবে বংশ বংশ ধরে।

হলফ করে বলতে পারি এ পর্যন্ত আমি কোন বিখ্যাত ব্যক্তিকে চাক্ষুষ দেখি নি বা দেখতে ইচ্ছাও হয় নি; কারণ বোধহয় শিব্রাম চক্রবর্তী। তাঁর একটা লেখার কথা আমি আজও ভুলতে পারি নি, তা হলো গরুর থেকে গরুর দুধ ভালো, তেমনি শিল্পী থেকে তাঁর শিল্প ভালো, গরুর কাছে গেলে যেমন তার শিঙের গুঁতো খাবার ভয় আছে, তেমন শিল্পীর সান্নিধ্যের স্মৃতি খুব মধুর নাও হতে পারে। আমি আবাল্য কলকাতাবাসী হয়েও তাই কোন বিখ্যাত সাহিত্যিক, কবি, অভিনেতা, অভিনেত্রী কাউকে দেখতে উৎসাহিত হই নি। কিন্তু আমার সত্যজিৎ রায়কে দেখার ও তাঁর বাড়িতে বসে কাজ করার ঘটনাটা হয়ে গেল অনেকটা সেই মারি তো হাতী আর লুটি তো ভাণ্ডার। হ্যাঁ প্রায় ভাণ্ডারই তো লুট করলাম, কারণ সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে বিদেশী বিদগ্ধ সমালোচনার মণি মঞ্জুষা দেখলাম তাঁর স্ক্র্যাপ বুকে। কত অসংখ্য পাতায় তাঁর অপুর ট্রিলজি, অভিযান, কাঞ্চনজঙ্ঘা নায়ক, তিন কন্যা, মহাপুরুষ কাপুরুষ, মহানগর, গুপী গাইন বাঘা বাইন, অরণ্যের দিন রাত্রি, প্রতিদ্বন্দ্বী এবং রবীন্দ্রনাথ ডকুমেন্টারি সম্পর্কে কত মূল্যবান প্রবন্ধ ও বিদেশী সংবাদ পত্রের ক্লিপিং, পড়লাম কিংবা কিছু কিছু অনুবাদ করলাম।

আমার মনে কিন্তু সত্তপড়া প্রফেসার হিজিবিজবিজের টাটকা স্মৃতি তখনো আছে, সত্যজিৎ রায়ের শেষ ছবি 'সীমাবদ্ধ' দেখিনি তাই অধুনা সত্যজিৎ বলতে আমার মনে তাঁর সাহিত্যিক উপস্থিতি উজ্জ্বল। চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় আমার মনে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত।

সাহেব পাড়ার অভিজাত নির্জনতা :

বিশপ লেফরয় রোডের তিনতলা ফ্ল্যাটে আমরা কয়েকজন জগৎবিখ্যাত চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের স্নিগ্ধ মনোরম পরিবেশ বৈঠকখানায় (ড্রয়িং রুমের পরিবর্তে বৈঠকখানা শব্দটা ব্যবহার করা উচিত, কারণ সাহেব পাড়ায় থেকেও সত্যজিৎ রায় যথার্থ পরিশীলিত বাঙালী, যেমন তালতলার চটি ও উড়নি পরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন চারিত্রনীতিতে যথার্থ ইউ-রোপিয়ান) কিংবা বাইরের বারন্দায় বসে কাজ করেছি। দেখেছি সেই আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব, অদ্ভুতকর্মী দীর্ঘদেহী আন্তর্জাতিক খ্যাত পুরুষটিকে, কখনো ডাকছেন ছেলে বাবুকে, বিকালে স্ত্রী ও বাড়ির আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলছেন, আমাদের সামনে দিয়ে আসছেন যাচ্ছেন। এ ক দি ন তো বাড়িতে কেউ ছিলো না, 'প্লিজ ডু নট ডিসটার্ব' দরজায় বেল টিপলাম, খুলে দিলেন দরজা তারপর আমাদের নিয়ে এসে বসালেন বৈঠকখানায় পাখা খুলে দিয়ে চলে গেলেন।

যে কয়দিন কাজ করেছি সে কয়-দিন বিকালে খাবার আসতো ভিতর বাড়ির থেকে। অবশ্য যে বাড়ির কর্তাবাবা হলেন 'খাই খাই'য়ের লেখক সে বাড়ির খাবার-দাবার সম্বন্ধে বর্ণনা করা বাতুলতা মাত্র। স্বদেশী ও বিদেশী, সন্দেশ থেকে প্যাসট্রি কেক, ডালমুট থেকে সিঙ্গাড়া। অবশ্য এ বাড়ির সন্দেশ ছানার নয়, সে সন্দেশ ছাপা সন্দেশ, একদা বাঙ্গালা শিশু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কিন্তু আমার এত খেয়েও মন ওঠে নি, কারণ গৃহকর্তা একবার এসেও বললেন না, 'এত খেয়ে তবু যদি নাহি ওঠে মনটা। খাও তবে কচু-পোড়া খাও তবে ঘণ্টা!'

সত্যজিৎ রায় এই নামটির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় আমার প্রিয় কবি জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতা গ্রন্থের প্রচ্ছদপট শিল্পী হিসাবে, তারপর বহু কবিতা গ্রন্থের প্রচ্ছদপট দেখিছি তাঁর অপূর্ব লেটারিং, আমার পড়ন্ত কৈশোরে দেখেছি তাঁর হারানো গ্রাম বাংলার অমল শৈশবের ছবি 'পথের পাঁচালী'র চিত্ররূপ। জীবনে প্রথম যে উপন্যাস পড়ে যেন সহোদরা শোকে কেঁদেছিলাম তা হলো দিদি দুর্গার মৃত্যুর বর্ণনা, আর উদ্দীপ্ত হয়ে-ছিলাম পথের পাচালীর শেষ লাইন পড়ে : পথের দেবতা ডাকিয়া বলে, পথ তোমার শেষ হয় নাই।

সাহিত্যপড়ার অনুভূতি নিয়ে পথের পাঁচালী দেখতে গিয়ে মনে লেগেছে ধাক্কা পরে একাধিকবার 'পথের পাঁচালী' দেখে বুঝতে পেরেছি ঘটনার আনু-পূর্বিক বিবরণ দেওয়া চলচ্চিত্রের কাজ নয়, শুধু বোধকে রূপান্তরিত করা ভালো চলচ্চিত্রের লক্ষণ। বিভূতি-ভূষণের জীবনবোধ যথাযথ রূপান্তরিত হয়েছে, কারণ সাহিত্য ও চলচ্চিত্র দুটি স্বতন্ত্র শিল্প মাধ্যম।

যা হোক একটু গুরুগম্ভীর হয়ে গেল ব্যাপারটা, এবার আবার আমার বিস্ময়ের কথায় আসা যাক, যেমন সত্যজিৎ রায়ের লিমেরিক পড়ে ভেবেছি তিনি ফুল টাইম সাহিত্য করলে অনেক খুচরো সাহিত্যিক-কবির ভাত মারতেন, যাক বাঁচোয়া সেটা তিনি করেন নি।

'গুপী গাইন বাঘা বাইন'এর মতো অভূতপূর্ব বাংলা ফ্যানটাসি ছবি দেখে মনে মনে যুগ যুগ জিও বলে 'হলে'র মধ্যে শব্দহীন চিৎকার করেছি।

এক ডজন গপ্প পড়ে এক ডজন চরিত্রের সাক্ষাৎ পেয়েছি, এবং মনে হয়েছে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র মতো চলচ্চিত্রের কাহিনী ও চিত্রনাট্য যিনি তৈরি করতে পারেন তিনি নিঃসন্দেহ সাহিত্যকর্মে সাংঘাতিক পারদর্শী।

দেশী বিদেশী সঙ্গীতে তাঁর গভীর জ্ঞান, স্বীকৃতির স্বাক্ষর দেখলাম ক্র্যাপ বুকের পাতায় বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের প্রবন্ধে ও সংবাদ ক্লিপিংয়ে। হয়তো রবীন্দ্রনাথের সঠিক সর্বগুণান্বিত উত্তর-পুরুষ সত্যজিৎ রায়।

কিন্তু এত গুণপনা সত্ত্বেও আমার কিছু অভিযোগ ও প্রশ্ন থেকে তাঁর সম্পর্কে, যেমন, কেন তিনি 'অশনি সংকেত' আজও তুললেন না; কিংবা মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' তিনি ছাড়া কে তুলতে পারে? 'ঘরে বাইরে'এর মতো উপন্যাস আজ পর্যন্ত চলচ্চিত্রায়িত হলো না, নাকি নায়িকার অভাবে।

তাছাড়া নিজের কাহিনী নিয়ে দু'খানা আধুনিক ছবি সত্যজিৎ রায় তুলেছেন; তাঁর 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ও 'নায়ক' যথেষ্ট আধুনিক। কিন্তু কেন তিনি পরের গল্পের আধুনিকতা ধার করতে যান, যেখানে প্রমাণ দিয়েছেন, আধুনিক যুগযন্ত্রণা নামক তথাকথিত ব্যাপার-স্যাপার তিনি যে কোন পেশা-দারী সাহিত্যিকের চেয়ে ভালো বোঝেন ও তার শিল্পীরূপ দিতে পারেন।

সত্যজিৎ রায় মনে হচ্ছে বহু দিন পর আবার তথাকথিক আধুনিক-তার মোহ থেকে ফিরে আসছেন তাঁর নিজের জায়গায়। তার পরবর্তী ছবি বুদ্ধদেব বসু'র 'একটি জীবন' গল্প, অনেকদিন আগে গল্পটি পড়েছিলাম, এবং আমার মনে হয়েছিলো এটি বুদ্ধ-দেব বসুর একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প, যার মধ্যে জ্ঞানতাপস এক স্কুলের শিক্ষকের জীবনে পার্টিশানের ট্র্যাজেডী মূর্ত হয়েছে। পার্টিশানের ট্র্যাজেডী নিয়ে এক ঋত্বিক ঘটক ছাড়া কোন শিল্পী-সাহিত্যিক তেমন কিছু করেন নি, তবে এতদিন পরে সত্যজিৎ রায় এগিয়ে আসছেন।

এতক্ষণ অনেক কিছু বলে ফেলেছি হয়তো এবার পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি হচ্ছে :—

এতক্ষণ আমার বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় দেখে এবার মুখ খুলবেন সত্যজিৎ-ভক্তরা এই বলে 'বেশ বলেছো ঢের বলেছো এইখানে দাও দাঁড়ি। হাটের মধ্যে ভাঙবে কেন বিদ্যা বোঝাই হাঁড়ি।

নিঃসঙ্গতা ও সত্যজিৎ রায়

শঙ্কর ঘোষ

একটি মনোরম শীতের বিকেল। রোদ ক্রমশ সরে যায়, ইতস্তত গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে দেখি টকটকে লাল সূর্যের গোলা ঝুলে পড়ছে। শীতকালের মলিন রুক্ষতা চারদিকের সমস্ত আঙ্গিকের ওপর একটা ফুলকাটা রেশমের মোটিফের কাজ করে দিয়েছে। হিঙ্গুল রঙের গুটি কয়েক পাতা শীতের হাওয়া সহ্য করতে না পেরে ঝরে যায়। বিশপ লেফ্রয় রোডের বড় বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে এই সব টুকরো টুকরো কথা মনে পড়ে। উঠোনে জাফরান রঙের অ্যাম্বাসাডার গাড়ি দাঁড়িয়ে। সঙ্গের সতীর্থ বললেন, ঐ তিনতলায় সত্যজিৎ রায় থাকেন।

কালো কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় অগণন ভাবনা মাথায় ঘুরছিল। তখন আমি ছোটদের একটি পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক। সত্যজিৎ বাবুর কথা ছিল আমাদের পত্রিকায় লিয়রের ছড়ার অনুবাদ দেবেন। তিনতলায় উঠে দেখি বাঁ দিকে লাইট ইয়োলো রঙের দরজার ওপর লেখা 'ডু নট ডিষ্টার্ব।' আমরা অবশ্য ডান দিকে গেলাম। সেখানেও একই রঙের দরজা। তার গা বেয়ে সবুজ রঙের মানিপ্ল্যান্ট লতিয়ে উঠেছে। দরজা খুলে যেতে দেখি আমার চোখের সামনেই আর একটি দরজা রয়েছে বারান্দার শেষে, তার রঙ কমলালেবুর মত। উত্তরের এই বারান্দাটি খুবই সুন্দর। একদিকে নানা ধরনের অঙ্কিত গাছ রয়েছে, তার মধ্যে খুবই অদ্ভুত বারোক ফ্লুরিং-এর কাজের মত সেই গুল্মের ড্রয়িং আজও আমাকে মুগ্ধ করে। বারান্দার দেওয়ালে 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' ইত্যাদি ছবির স্টিল ঝুলছে। কার্নিশের ফাঁক দিয়ে কলকাতার সাহেব পাড়ার ল্যাণ্ডস্কেপ দেখছিলাম। যদিও অন্ধকার তখন চারকোল স্টাডির মত চারদিকে গেড়ে বসেছিল। সতীর্থ জানালেন, আপাতত বাড়িতে কেউ নেই, অপেক্ষা করা যাক।

আমি বসে বসে ভাবছিলাম। সত্যজিৎবাবুর কথাই স্বভাবতঃ মনে পড়ছিল। তিনি একজন শিল্পী, একথা বললে খুব ভুল হবে। কারণ তিনি আমাদের চলচ্চিত্রের শিল্পগুরু, তুলির আঁচড়ে কাজ না করে তিনি ক্যামেরার মধ্যে দিয়ে করেন। যে কোন শিল্প-রসিক জানেন ক্যানভাসের বিস্তৃতি না থাকলেও কোন শিল্পী নিজের ইচ্ছেমত মিডিয়াম বেছে নিতে পারেন। আমরা সত্যজিৎবাবুর 'পথের পাঁচালী'র অমুক দৃশ্য ভাল, ওই অভিনয় অসাধারণ বলি, কিন্তু সমস্ত ছবিটিই এমন শিল্পরসসমৃদ্ধ যে বিশেষ কোন জায়গা ভাল লাগবার উপায় নেই। এ বিষয়ে প্রখ্যাত কলা-রসিক শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী আমাকে বলেছিলেন যে পাখির ডাক কি রকম বলতে গিয়ে আমরা অযথা কিছু বিশেষণের অপব্যবহার করি, কারণ বাস্তবিক তার কোন অর্থ হয় না। সেই রকম 'পথের পাঁচালী' আমাদের কি রকম লাগে বলা দুষ্কর। পাখির ডাকের মতই কোন বিশেষণে তাকে প্রকাশ করা যায় না।

'পথের পাঁচালী'র ইন্দির ঠাকরুণ, তাঁর সমস্ত মুখমণ্ডলকে ঘিরে যে শুষ্ক হাহাকার, নিষ্ঠুর হিজিবিজি, তা যদি আমরা এচিং-এ দেখতাম নিশ্চয় আমাদের মনোরঞ্জন করত, কিন্তু সিনেমায় ইন্দির ঠাকরুণকে মনে হয়েছিল এল গ্রেকোর ছবি। যিনি শারিরীক কোন সামঞ্জস্য না রেখেও পেন্টিং-এর সৌন্দর্য বজায় রাখতেন। আর একটি দৃশ্যের কথা ভাবা যাক। যেখানে অপু আর দুর্গা বিয়ে বাড়ির সমারোহ দেখছে। তাদের চোখে মুখে অজানা কৌতুহল, অগাধ বিস্ময়! স্বতঃই আমাদের মন ভিক্টোরিয়ান যুগের পেন্টিং-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। কতকগুলি ভিখারী ছেলেমেয়েরা বিলাসবহুল থিয়েটারের সামনে দাঁড়িয়ে, তাদের চোখে মুখে বিহ্বল দৃষ্টি, এইজন্যে যে এক ধনী দম্পতি মূল্যবান পোশাক পরে জুড়ি-গাড়ি থেকে নামছে। 'পথের পাঁচালী'র এই বিশেষ দৃশ্য আর ভিক্টোরিয়ান যুগের ছবি; দুই আমাদের মনে করুণার উদ্রেক করে, কারণ শিল্পীরা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, ভিন্ন মাধ্যমে তাঁদের অনুভব ব্যক্ত করেছেন।

'পোস্টমাস্টার' ছবির একটি দৃশ্য আমাকে প্রায়ই বিষণ্ণ করে তোলে। কারণ এখানেও শিল্পগুরু করুণরসের সার্থক সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন বলে মনে হয়। ছবিটির একেবারে শেষের দিকে :

নন্দ ডাকে, রতন!

রতন কোন উত্তর দেয় না।

নন্দ অবাক হয়ে টাকাটাকে দেখে, তারপর কয়েক পা এগিয়ে যায়, সে প্রায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, আবার পেছন দিকে ফিরে দেখে। দেখতে পায়, জলের বালতিটা রাস্তায় রেখে রতন তার দিকে তাকিয়ে আছে, নন্দর সঙ্গে চোখাচোখি হওয়া মাত্র তার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে সে জলের বালতি তুলে নেয়, তারপর পোস্টঅফিসের ছোট উঠোনটায় নেমে চলে যায়। নন্দ টাকাটাকে দেখে এবার কান্নায় ভেঙে পড়ে, তার চোখের কোণে জল আর ঠোঁট দুটো কাঁপতে থাকে।

হঠাৎ সে শুনতে পায় রতনের ডাক, নতুনবাবু, জল এনেছি।

নন্দ সঙ্গে সঙ্গে চমকে ফিরে দেখে, ঠোঁট চেপে সে আবার রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকে। রাস্তার পাশে বিশে পাগলটা চুপচাপ বসে আছে।

(ফেড আউট)

এই প্রায় নিঃশব্দ ফ্রেমগুলির মধ্যে অদ্ভুত একটা যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে। বিষণ্ণতা, তার গভীর বেদনা, আমাদের হৃদয়কে জ্বালিয়েপুড়িয়ে খাক্ করে দিয়েছিল। শিল্পগুরুর এই সৌন্দর্যবোধ তাঁর এযাবৎ নির্মিত প্রায় সব ক'টি ছবির মধ্যেই রয়েছে। অনেক খর্বকায় বাবরিচুলো চলচ্চিত্রবিদ আছেন, যাঁরা শুধুই কম্পোজিশন দেখে মুগ্ধ হন। অথচ সিনেমা বিটল লাইফ নয়। শুধু কম্পোজিশন কখনই কোন পরিচালকের বক্তব্য হতে পারে না। ফ্রেমিং বোধ থাকলেও অন্যান্য শিল্পবোধ যুক্ত হয়ে পড়ে।

'চারুলতা' ছবিটি এককথায় শিল্পগুরুর অনুকরণীয় সৃষ্টি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগন ঠাকুরের তুলি চালনার মত রঙের ভেরিয়েশন গঠিত হয়েছে। যে কারণে এ ছবিটি দেখবার সময় আমাদের মন পয়ারবিলাসী হয়ে উঠে। প্রথমদিককার ছবি ছেড়ে দিলেও পরবর্তীকালে তাঁর বিভিন্ন ছবির মধ্যে ফ্রেমের সুষমা বজায় আছে। 'চিড়িয়াখানা'র অহর গাঙ্গুলী আর উত্তমকুমারের কথোপকথন, অভিমানে আড়াআড়িভাবে ওয়াহিদার কাঁধা ধরে থাকা, নায়কের প্রথম স্বপ্নদৃশ্যে, 'অরণ্যের দিনরাত্রি'তে মেলার দৃশ্য আমাদের মনে থাকবে। 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র স্বপ্নদৃশ্যটি তুলনারহিত। 'সুররিয়ালিজম' চিন্তাধারার সমাবেশ ঘটিয়ে এই ফ্রেমগুলি যেন স্বপ্নের ল্যাণ্ডস্কেপ। অথবা ম্যাজিক রিয়ালিজম বলা যায়।

শিল্পগুরু সত্যজিৎবাবুর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল বেশ রাতে, আমি অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলাম তাঁর দিকে, কিছু কি বুঝতে চেষ্টা করছিলাম, না বোধ হয়। তবুও আমার মধ্যে একটা অদ্ভুত আনন্দ জেগেছিল। যেমনটি বহুদিন আগে গোপালপুরে হয়েছিল। পূর্ণিমার রাত। সমুদ্রেরধারে আমি বসেছিলাম। সামনে মিশমিশে কালো অন্ধকার। শুধু সমুদ্রের গর্জন। চুপচাপ ভাবছিলাম। কিছুক্ষণ পর চাঁদ উঠেছিল। সেই বিশাল ঢেউএর মাথায় প্রথম চাঁদের আলো দেখে অভিভূত হয়ে গেলাম। তারপর সমস্ত সমুদ্র; যেন রূপোর পাতে মুড়ে ফেলল। সেই সমুদ্রতীরে আমি একা; আমার শিল্পবোধ একা। নির্জনতার মধ্যে আমি সমুদ্রতীরে উন্মাদের মত ছুটেছিলাম। কেন, তা আজও আমার কাছে অজ্ঞাত। শিল্পগুরুকে দেখেও আমার মনে তাই হয়েছিল। তারপর ওই বাড়ির সঙ্গে কত গভীরভাবে, ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছি, কিন্তু ওইরকম ভয়ঙ্কর সুন্দর অনুভব কোনদিন হয় নি। সম্ভবত তাঁর মধ্যেকার বিশাল শিল্পবোধের সামনে দাঁড়িয়ে (ফিজিক্যালি) আমার সমস্ত শরীর ঐ রকম হয়ে উঠেছিল।

সম্পাদক : বীরেন সিমলাই। সম্পাদক কর্তৃক অশোক প্রেস, ১৫ ডিকসন লেন, কলিকাতা-১৪ থেকে
মুদ্রিত ও ৭২/৫বি, আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোড, কলিকাতা-১৪ থেকে প্রকাশিত। ফোন : ২৪-৫৭৮২

রতন কোন উত্তর দেয় না।

নন্দ অবাক হয়ে টাকাটাকে দেখে, তারপর কয়েক পা এগিয়ে যায়, সে প্রায় কান্নায় ভেঙে পড়ে, আবার পেছন দিকে ফিরে দেখে। দেখতে পায়, জলের বালতিটা রাস্তায় রেখে রতন তার দিকে তাকিয়ে আছে, নন্দর সঙ্গে চোখাচোখি হওয়া মাত্র তার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে সে জলের বালতি তুলে নেয়, তারপর পোস্টঅফিসের ছোট উঠোনটায় নেমে চলে যায়। নন্দ টাকাটাকে দেখে এবার কান্নায় ভেঙে পড়ে, তার চোখের কোণে জল আর ঠোঁট দুটো কাঁপতে থাকে।

হঠাৎ সে শুনতে পায় রতনের ডাক, নতুনবাবু, জল এনেছি।

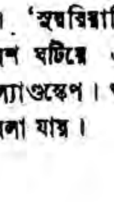
নন্দ সঙ্গে সঙ্গে চমকে ফিরে দেখে, ঠোঁট চেপে সে আবার রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকে। রাস্তার পাশে বিশে পাগলটা চুপচাপ বসে আছে।

(ফেড আউট)

এই প্রায় নিঃশব্দ ফ্রেমগুলির মধ্যে অদ্ভুত একটা যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে। বিষণ্ণতা, তার গভীর বেদনা, আমাদের হৃদয়কে জ্বালিয়েপুড়িয়ে খাক্ করে দিয়েছিল। শিল্পগুরুর এই সৌন্দর্যবোধ তাঁর এযাবৎ নির্মিত প্রায় সব ক'টি ছবির মধ্যেই রয়েছে। অনেক খর্বকায় বাবরিচুলো চলচ্চিত্রবিদ আছেন, যাঁরা শুধুই কম্পোজিশন দেখে মুগ্ধ হন। অথচ সিনেমা স্টিল লাইফ নয়। শুধু কম্পোজিশন কখনই কোন পরিচালকের বক্তব্য হতে পারে না। ফ্রেমিং বোধ থাকলেও অদ্ভুত শিল্পবোধ যুক্ত হয়ে পড়ে।

'চারুলতা' ছবিটি এককথায় শিল্পগুরুর অনুকরণীয় সৃষ্টি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগন ঠাকুরের তুলি চালনার মত রঙের ভেরিয়েশন গঠিত হয়েছে। যে কারণে এ ছবিটি দেখবার সময় আমাদের মন পদ্মারবিলাসী হয়ে উঠে। প্রথমদিককার ছবি ছেড়ে দিলেও পরবর্তীকালে তাঁর বিভিন্ন ছবির মধ্যে ফ্রেমের সুষমা বজায় আছে। 'চিড়িয়াখানা'র জহর গাঙ্গুলী আর উত্তমকুমারের কথোপকথন, অভিমানে আড়াআড়িভাবে ওয়াহিদার কাঁথা ধরে থাকা, নায়কের প্রথম স্বপ্নদৃশ্যে, 'অরণ্যের দিনরাত্রি'তে মেলার দৃশ্য আমাদের মনে থাকবে। 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র স্বপ্নদৃশ্যটি তুলনারহিত। 'সুররিয়ালিজম' চিন্তাধারার সমাবেশ ঘটিয়ে এই ফ্রেমগুলি যেন স্বপ্নের ল্যাণ্ডস্কেপ। অথবা ম্যাজিক রিয়ালিজম বলা যায়।

শিল্পগুরু সত্যজিৎবাবুর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল বেশ রাতে, আমি অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলাম তাঁর দিকে, কিছু কি বুঝতে চেষ্টা করছিলাম, না বোধ হয়। তবুও আমার মধ্যে একটা অদ্ভুত আনন্দ জেগেছিল। যেমনটি বহুদিন আগে গোপালপুরে হয়েছিল। পূর্ণিমার রাত। সমুদ্রেরধারে আমি বসেছিলাম। সামনে মিশমিশে কালো অন্ধকার। শুধু সমুদ্রের গর্জন। চুপচাপ ভাবছিলাম। কিছুক্ষণ পর চাঁদ উঠেছিল। সেই বিশাল ঢেউএর মাথায় প্রথম চাঁদের আলো দেখে অভিভূত হয়ে গেলাম। তারপর সমস্ত সমুদ্র; যেন রূপোর পাতে মুড়ে ফেলল। সেই সমুদ্রতীরে আমি একা; আমার শিল্পবোধ একা। নির্জনতার মধ্যে আমি সমুদ্রতীরে উন্মাদের মত ছুটেছিলাম। কেন, তা আজও আমার কাছে অজ্ঞাত। শিল্পগুরুকে দেখেও আমার মনে তাই হয়েছিল। তারপর ওই বাড়ির সঙ্গে কত গভীরভাবে, ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছি, কিন্তু ওইরকম ভয়ঙ্কর সুন্দর অনুভব কোনদিন হয় নি। সম্ভবত তাঁর মধ্যেকার বিশাল শিল্পবোধের সামনে দাঁড়িয়ে (ফিজিক্যালি) আমার সমস্ত শরীর ঐ রকম হয়ে উঠেছিল।



সম্পাদক : বীরেন সিমলাই। সম্পাদক কর্তৃক অশোক প্রেস, ১৫ ডিকসন লেন, কলিকাতা-১৪ থেকে
মুদ্রিত ও ৭১/৫বি, আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোড, কলিকাতা-১৪ থেকে প্রকাশিত। ফোন : ২৪-৫৭৮২

Regd. No. C 351. GHAROA Bengali Weekly : 26 May '72 : ১২ জ্যৈষ্ঠ '৭৯ Rs.

